পৃথিবীর বাইরে কি বুদ্ধিমান জীব আছে?

অরূপরতন ভট্টাচার্য

সমকাল প্রকাশনী
৮/২এ, গোয়ালটুলি লেন,
কলকাতা-৭০০০১৩

প্রথম প্রকাশ :
বৈশাখ : ১৩৭২

প্রকাশক :
প্রসূন কুমার বসু
সমকাল প্রকাশনী
৮/১এ, গোয়ালটুলি লেন,
কলকাতা-৭০০০১৩

প্রচ্ছদ :
গৌতম রায়

অলংকরণ :
জয়ন্ত চৌধুরী

প্রচ্ছদ ব্লক:
সি বি. এইচ প্রসেস (ক্যালকাটা)
কলকাতা-৭০০০০২

মুদ্রাকর :
তারক ঘোষ
রামকৃষ্ণ প্রেস ।
কলকাতা-৭০০০১৪

অধ্যাপক রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী

বন্ধুবরেষু

শিল্পীর দৃষ্টিতে সাইক্লোপের সম্পূর্ণ চিত্র।

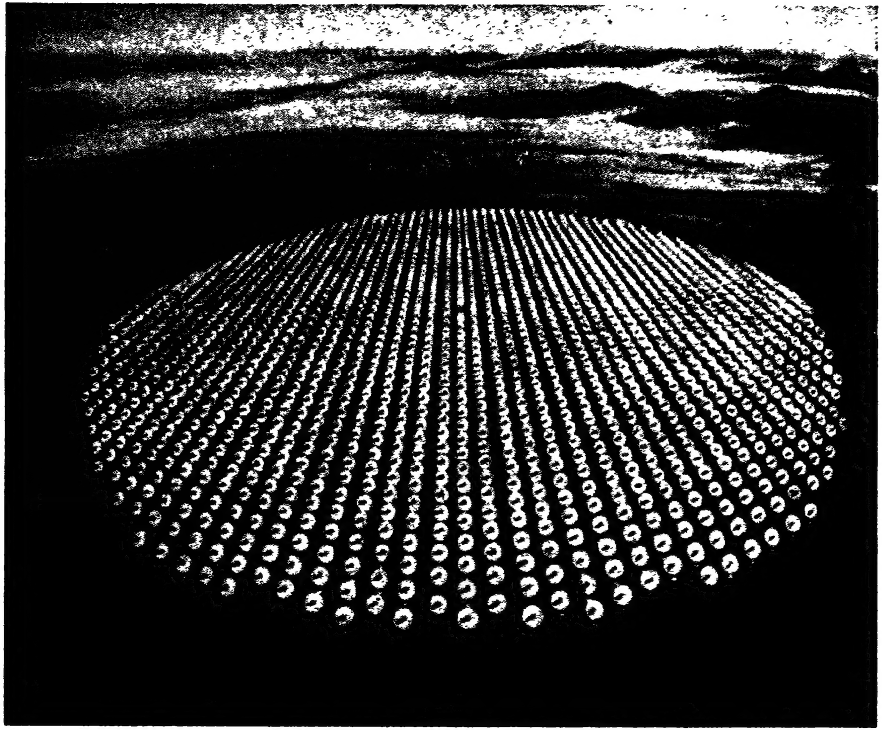

আরেসিবো মানমন্দির—বহির্জাগতিক জীবের অনুসন্ধানের কাজ চলেছে এখানে।

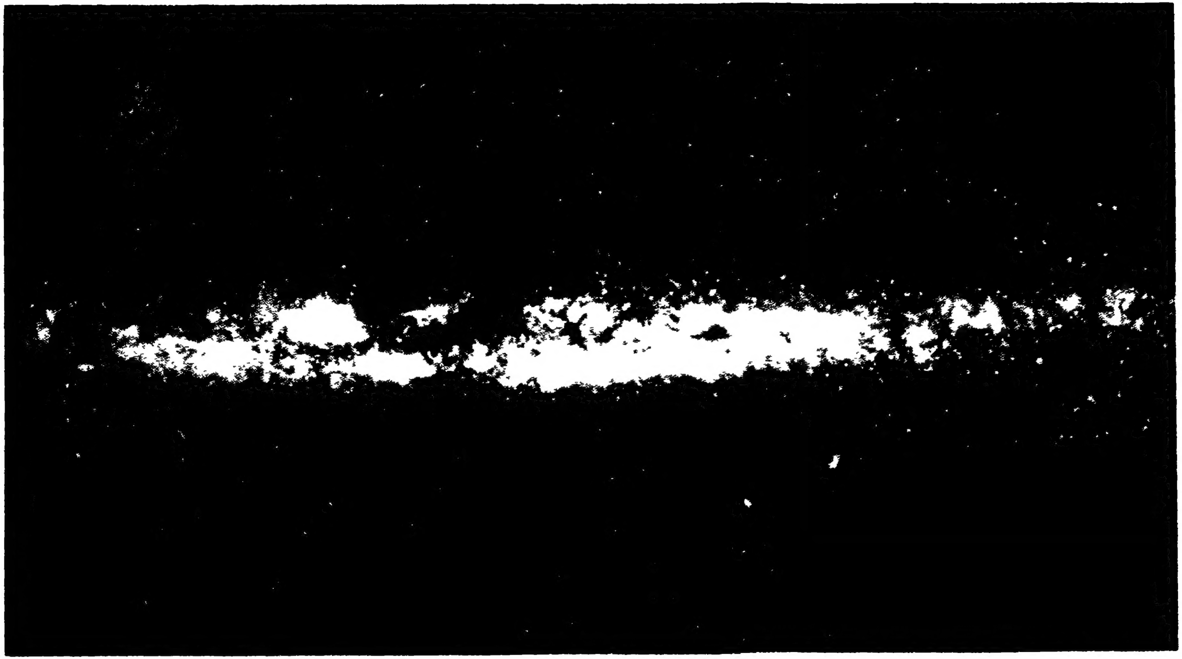

আমাদের নক্ষত্রলোক   এই নক্ষত্রলোকের কোটি কোটি তারকার মধ্যে কোথাও কি উন্নত জীবের কোনো অস্তিত্ব নেই ?

কানট—১৭৫৫

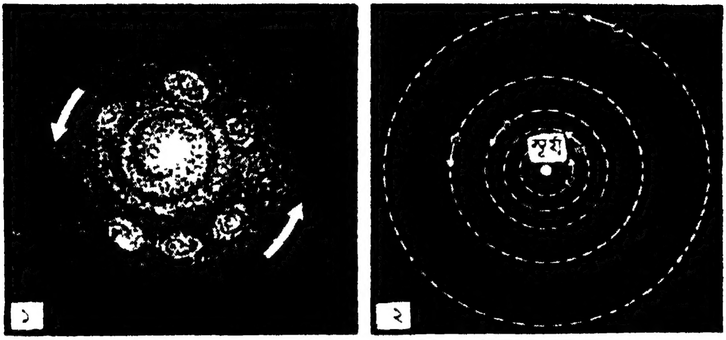

লাপলাস—১৭৯৬

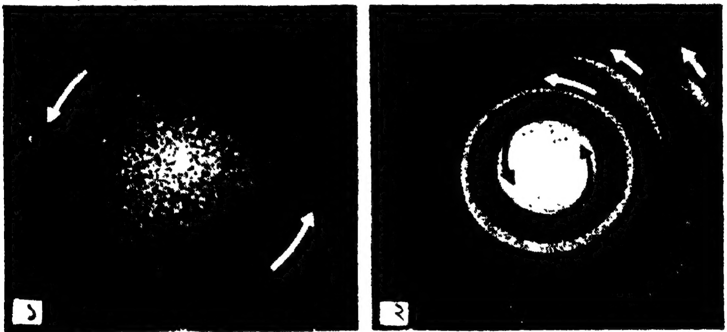

চেমবারলিন-মোলটন ১৯০১ – ০৫

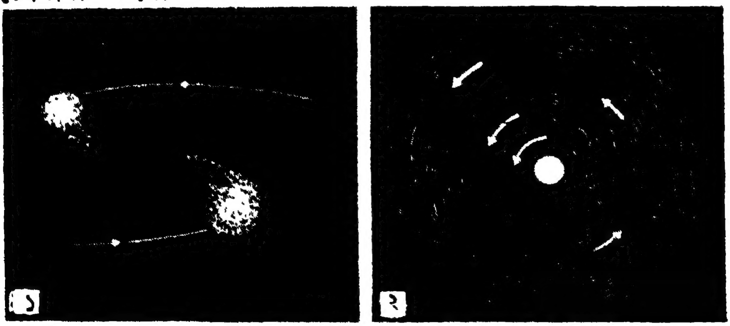

সৌরজগতের উৎপত্তি—তিনটি মতবাদ। এইভাবে তো কত সৌরজগতেরই সৃষ্টি হতে পারে।

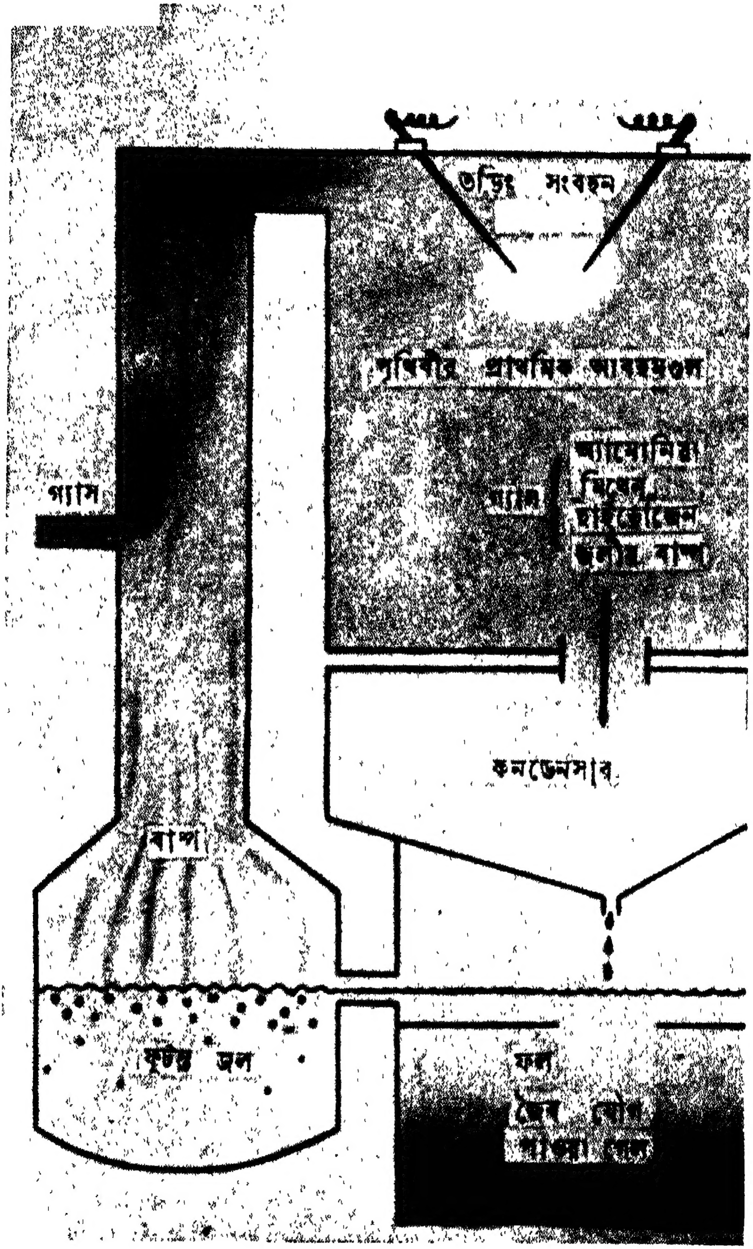

পৃথিবীর প্রাথমিক অবস্থায় প্রাথমিক আবহমণ্ডলে জৈব যৌগের উদ্ভব কি সম্ভব ?
মিলারের গবেষণায় প্রমাণিত হল, হ্যাঁ সম্ভব।

গ্রীণ ব্যাঙ্কে ৮৫ ফুট ব্যাসযুক্ত বেতার-দূরবীক্ষণ। বহির্জাগতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই দূরবীক্ষণ ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে।

পূর্বভাষ

মর্ত্যের বুকে দাঁড়িয়ে তারকাখচিত রাত্রির আকাশে একবার আমাদের দৃষ্টিকে মেলে ধরি। পৃথিবীর বাইরে, পৃথিবীর মাটি ছাড়িয়ে সীমাহীন, অনন্ত মহাশূন্যে উন্নত, সভ্য বুদ্ধিমান জীব কোথায় আছে? কোথায় আছে এমন এক সভ্যতা, তুলনায় হয়তো আমাদের সমতুল, আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী, কিম্বা তুলনায় নগণ্য, আমরা তাদের কাছে অকিঞ্চিৎকর, যাদের কথা অসীম কৌতূহলে আলোচিত হয়েছে যুগে যুগে, কালে কালে, সকল সম্প্রদায়ের ছোট বড় সকল মানুষের বাঙ্ময় কল্পনায়।

রূপকথায় আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী চাঁদেই বোধহয় আমরা জীবন এবং জীবের অস্তিত্বের কথা কল্পনা করেছি সকলের আগে। পূর্ণিমার আলো ভরা অন্ধকারে যে অপরূপ পূর্ণচন্দ্রকে আমরা পূর্ব আকাশে উদিত হতে দেখি, মানবমন কোন্ অনাদি কাল থেকে কল্পনা করে এসেছে, সে প্রাণহীন বা জীবনশূন্য নয়।

কিন্তু এ জাতীয় কল্পনার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল না। বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আশা করাও সঙ্গত নয়। কিন্তু মানব কৌতূহল নিবৃত্ত করবে কে? এই পৃথিবীতে যদি জীবন থাকে, এই পৃথিবী যদি উন্নত জীবের বসবাসে সুন্দর, শোভন হয়ে ওঠে, তবে যে সব গ্রহ-উপগ্রহ রাত্রির অন্ধকারে মহাকাশে আবর্তনরত লক্ষ্য করা যায়, কেন সে সব গ্রহ-উপগ্রহ জীব অধ্যুষিত নয়? অন্ততপক্ষে পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্র?

মানুষের কল্পনায় বহির্বিশ্বে বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব সংক্রান্ত ধারণার এক ধাপ অগ্রগতি ঘটে টেলিস্কোপ আবিষ্কার হওয়ার পরে। যা ছিল একেবারে কল্পনানির্ভর, সেটি বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষায় যাচাই হওয়ার সম্ভাবনা এতদিনে পাওয়া গেল। অপ্রত্যক্ষ দূরের বস্তু টেলিস্কোপের মাধ্যমে অনেক সুস্পষ্ট হল মানব-দৃষ্টির সম্মুখে।

কিন্তু বহির্বিশ্বে বুদ্ধিমান জীবের অনুসন্ধানে দূরবীক্ষণ অকিঞ্চিৎকর। কৌতূহল এবং নিষ্ঠায় বিজ্ঞানের পরিমণ্ডল যখন আরও পরিব্যাপ্ত হল, জীব-বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, পরিসংখ্যান-তত্ত্বের যখন প্রভূত উন্নতি ঘটল, মহাজাগতিক রহস্য তখন উন্মোচিত হতে শুরু করল ক্রমে ক্রমে। আজ সকল রহস্যের অবসান হয়েছে এমন নয়, আদি অন্তহীন ব্রহ্মাণ্ডের পরম রহস্য আজও

অনুদ্‌ঘাটিত, তবু বিজ্ঞান আজ স্থির লক্ষ্যে মহাবিশ্বের যত রহস্যকে অনবগুণ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছে, তাতে বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্বের বিষয়ে সকলেই আজ প্রত্যয়সম্পন্ন। ফলে সেই প্রশ্নটিকে সামনে রেখে আজ সকলেই দ্বিধাহীন চিত্তে, বিজ্ঞাননির্ভর দৃষ্টিভঙ্গীতে জবাব দেবেন। বলবেন হ্যাঁ, আছে, সৌরমণ্ডলের বাইরে, অর্থাৎ বহির্বিশ্বে বুদ্ধিমান জীব আছে।

প্রথম অধ্যায়

আজ পর্যন্ত জীবন সম্পর্কে অনেক কথাই জানা সম্ভব হয়েছে। সেই সব কথার পরিপ্রেক্ষিতে জীবনের একটি সংজ্ঞা নিরূপণ করা যাক।

জীবনের সংজ্ঞা কি? জীবন বলতে আমরা কি বুঝি? সে কোন্ অর্থ বহন করে? কোন্ ধারণায় তার সকল বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে?

বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞেরা তাঁদের আপন আপন ক্ষেত্রের আলোকে জীবনের সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করেছেন। যা জ্ঞাত তাকে অবলম্বন করেই সংজ্ঞা বা ধারণা গঠিত হয়, কিন্তু সে সংজ্ঞা স্বয়ংসম্পূর্ণ এমন কথা বলব কি করে?

বিজ্ঞানের যতগুলি আলোকে জীবনের সংজ্ঞা তার একটির কথা এখানে তুলে ধরি: জীবন একটি প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে খাদ্যগ্রহণ, বিপাকক্রিয়া সম্পাদন, রেচন, শ্বাসগ্রহণ, চলন, পুষ্টিসাধন, জনন, বহিঃস্থ উত্তেজনায় সংবেদন প্রভৃতি দিকগুলি সক্রিয়। জীবনের এই সংজ্ঞাটি শারীরবৃত্তিভিত্তিক এবং জনপ্রিয়ও বটে।

কিন্তু এই সংজ্ঞাটি কি আদর্শ? এই সংজ্ঞা কি গ্রহণযোগ্য? স্বচ্ছ দৃষ্টিতে নজরে আসবে, এই সব বৈশিষ্ট্য জীবন্ত নয় এমন বস্তুর মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। আবার বিপরীত দিকটিও সম্ভব। জীবন্ত এবং প্রাণ থাকা সত্ত্বেও এমন অনেক প্রাণীর পরিচয় পাওয়া যায়, যেগুলির মধ্যে এই সব ধর্মের অভাব দেখা যায়। যদি একটি চলমান মোটর গাড়ীর কথা বলি, এটা কি সচল, অতএব জীবনযুক্ত না নিষ্প্রাণ এবং জড়? আমরা সবাই বলব এটিতে জীবন থাকার কোন কথাই ওঠে না এবং চলমান হলেও এই মোটরযান নিঃসন্দেহে জড় পদার্থ। কিন্তু অন্য কোনো গ্রহ বা দূরলোক থেকে যদি কোনো আগন্তুক আসেন যিনি এই পৃথিবীর সব কিছুর সঙ্গেই চিন্তা ভাবনায় সম্পূর্ণ অপরিচিত,

তাহলে ? এই মোটরযানগুলি দেখে তিনি কি বলবেন, কি ভাববেন ? অনুমান হয়, পৃথিবীর বুকে মোটরযানের সংখ্যা, তাদের ঘুরে বেড়ানোর ভঙ্গী এবং তাদের অনায়াস গতির জন্যে নগর বিন্যাস দেখে অন্য গ্রহের কোনো আগন্তুকের মনে হতে পারে হ্যাঁ, এরা সজীব প্রাণী। আর শুধু জীবনযুক্ত নয়, পার্থিব গ্রহের উপর এরা অতি উন্নত ধরনের জীব।

মোটরযানগুলির মধ্যে কি জীবনের বৈশিষ্ট্য আছে ? হ্যাঁ অবশ্যই। আমরা বলতে পারি, সে খাদ্য গ্রহণ করে, বিপাক ক্রিয়া চলে তার মধ্যে, রেচনও তার একটি ধর্ম। শ্বাস প্রক্রিয়ায় সে অংশ গ্রহণ করে, সে চলাচলে সক্ষম এবং বহিঃস্থ বা পারিপার্শ্বিকে সে সংবেদনশীল। প্রয়োজনবোধে সে দ্রুত চলে, কখনও বা ধীরে, তা ছাড়া ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সে দিক পরিবর্তনও করে।

এ তো গেল জীবন না থাকা সত্ত্বেও জীবনের অভিব্যক্তির পরিচয়। আবার জীবন থাকা সত্ত্বেও জীবনের শারীরবৃত্তিভিত্তিক সংজ্ঞা শর্ত পূরণ করে না, এমনও দেখা যায়। কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে জীবন ধারণের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য শ্বাসক্রিয়ায় যারা অংশ গ্রহণ করে না। কিন্তু তাদের মধ্যে জীবনের লক্ষণ নেই, এমন কথা বলা চলে না।

জীবনের আরও একাধিক সংজ্ঞা আছে—বিপাক সংক্রান্ত ধারণায় জীবনের পরিচয়, প্রাণরাসায়নিক দিক দিয়ে জীবনের অভিব্যক্তি। এই সব সংজ্ঞার কোনোটিই অনুল্লেখ্য নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা আজ পর্যন্ত এ ধরনের কোনো সংজ্ঞাকেই নিশ্ছিদ্র বলা চলে না।

এসবের পরেই আসছে জেনেটিকসের নিরিখে জীবনের সংজ্ঞা এই পৃথিবীর বুকে যত প্রকারের জীব লক্ষ্য করা যায়, এক কোষ-বিশিষ্ট প্রাণী থেকে বহুকোষী মানব সন্তান পর্যন্ত, এদের প্রত্যেকেরই আপন আপন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে। প্রকৃতি থেকে খাদ্য গ্রহণ করে এরা জীবন ধারণ করে কিন্তু প্রজননে এরা আশ্চর্যভাবে নিজেদেরই সৃষ্টি করে চলেছে।

এই যে মানব-সৃষ্টি, বাউলের গানের কলিতে যার দিকে তাকিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, 'কে গড়িল এমন ঘর সে যে ধন্য কারিগর', তার বিভিন্ন বংশগত বৈশিষ্ট্য যে পদার্থটি বহন করে নিয়ে চলেছে এক ধারা থেকে অন্য ধারায়, যার ফলে মানবশিশু মানববৈশিষ্ট্য নিয়েই ভূমিষ্ঠ হচ্ছে পৃথিবীতে, কোকিলের বাচ্চা কোকিলের কণ্ঠ নিয়েই জন্মগ্রহণ করছে, তাকে বলে বংশাণু বা জিন (Gene)। এই বংশাণুই মানববৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন বহিঃপ্রকাশের জন্যে দায়ী। প্রজননের সময়ে পুরুষ ও নারীর কোনো বংশবৈশিষ্ট্য নির্ধারক গুণ সন্তানের মধ্যে সংক্রামিত হয়। যখন একটি জীবন থেকে আর একটি জীবনের সৃষ্টি হয়, তখন এই বংশাণুগুলিই বংশবৈশিষ্ট্যের বাহক হয়ে থাকে।

অবশ্য এই সৃষ্টির ক্ষেত্রে কখনো কখনো অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হয়। এই অস্বাভাবিকতার কারণ বংশাণুর ক্ষেত্রে পরিব্যক্তি (Mutation)। বিষয়টা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। সাধারণ ক্ষেত্রে এক একটি বংশাণুর মাধ্যমে বংশবৈশিষ্ট্যের যে নির্দেশ বা সংকেত পরবর্তী ধারায় সংক্রামিত হয়, পরিব্যক্তির ক্ষেত্রে একটি অস্বাভাবিক বংশাণু এসে পড়ায় সেই সংকেতের বা নির্দেশেরও পরিবর্তন ঘটে। আর দুর্ভাগ্যের কথা পরবর্তী বংশধারাগুলিতে এই অস্বাভাবিকতাই ফুটে ওঠে। কতদূর বা কতকাল এই পরিব্যক্তির ধারা চলবে? চলবে সেই সময় পর্যন্ত যতক্ষণ না পরিব্যক্ত বংশাণু আবার পরিব্যক্তির ভেতর দিয়ে স্বাভাবিক হয়ে আসে। পরিব্যক্তির ভেতর দিয়ে যে অস্বাভাবিকতা দেখা যায়, সে অস্বাভাবিকতা যে সর্বদা দুর্লক্ষণ এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা সত্য। দুর্ঘটনার ফল মঙ্গলজনক—এমনটি কে কোথায় শুনতে পায়? তবু হতে পারে কতকগুলি পরিব্যক্তি আছে জীবনের পক্ষে যারা সুলক্ষণযুক্ত এবং এটা ঠিক যে, বংশপর্যায়ে সুলক্ষণযুক্ত ধারাটাই বজায় থাকার কথা। এই যে আকস্মিক এবং অনুকূল পরিবর্তন, পরিবেশের সঙ্গে এটি অধিকতর মানানসই। এইভাবে জীবন ক্রমশ সুন্দর, অর্থযুক্ত এবং অধিকতর জটিল হয়ে ওঠে। আজ আমাদের

নিজেদের দিকে তাকালে আমরা সে কথা সহজেই বুঝতে পারি।

এই তো জীবন! পরিচিত বা তাত্ত্বিক যে কোনো সংজ্ঞার ভিত্তিতেই তার অভিব্যক্তি ঘটুক না কেন, সুন্দর, উন্নত এবং পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এই জীবনের আধারই তো বুদ্ধিমান জীব। সেই বুদ্ধিমান জীবের পরিচয় কি আছে ব্রহ্মাণ্ডের অন্য কোথাও, অন্য কোনোখানে? বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পূর্ব পর্যন্ত যে ভাবনা ছিল বিক্ষিপ্ত, পারম্পর্যহীন এবং যার মধ্যে বৈজ্ঞানিক ব্যুৎপত্তির অভাব ছিল, পরবর্তী পর্বে তার মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উত্তরণের চেষ্টা দেখা গেল। বহির্বিশ্বে এই সৌরমণ্ডলের বাইরে বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্বের সম্ভাবনা কতটা? যে সীমাহীন মহাশূন্য চলে গিয়েছে কোনো এক নক্ষত্রলোকের এক গ্রহ পরিবার থেকে অন্য গ্রহ পরিবারে, এক নক্ষত্রলোক থেকে অন্য নক্ষত্রলোকে বা সেই সীমাকেও অতিক্রম করে আরও যে নিজেকে বিস্তৃত করেছে, সেই অনন্ত মহাশূন্যের মধ্যে বুদ্ধিমান জীব হিসেবে মানুষ, ভাবলে বিস্ময় বোধ হয়, শুধু সৃষ্টি হল পৃথিবীতে আর কোথাও নয়? এই পৃথিবীই শুধু বুদ্ধিমান প্রাণী অধ্যুষিত, আর কোথাও তার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।

হতে পারে, কোনো একটি নির্দিষ্ট গ্রহ জীবনশূন্য। হয়তো সেখানে প্রাচীন কোনো বস্তুর জৈবিক ধ্বংসাবশেষ নেই। হয় তো বিলুপ্ত কোনো প্রাণীর জীবাশ্মও পাওয়া যাবে না সেখানে। আবার এমনও হতে পারে যে, আজ সেখানে জীবন নেই কিন্তু হয়তো সেখানে আছে জৈবিক রাসায়নিক বস্তু বা বিলুপ্ত প্রাণীর জীবাশ্ম। হয় তো সেখানে জীবনেরই অভিব্যক্তি আছে—সে এক সহজ, সরল জীবন বা আচার, ধর্ম, আচরণে সে জীবন জটিল এবং দুর্বোধ্য। কিম্বা যদি এমন হয়, সেখানে আছে বুদ্ধিমান প্রাণী—প্রযুক্তি বিজ্ঞানের দিক দিয়ে সভ্য, উন্নত।

আমাদের নক্ষত্রলোকের বাইরে বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্বের সম্ভাবনা কতটা? মানুষ দীর্ঘকাল ধরে ভেবে আসছে সে কি একক এবং অনন্য? না কি এমন অন্য লোক আছে, এমন অন্য জগৎ আছে

যেখানে প্রায় তারই মত প্রাণীর অস্তিত্ব সম্ভব ? অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের দিকে তাকালে পৃথিবী ছাড়িয়ে জীবনের অস্তিত্বের সন্ধানে যতগুলি অভিমত সংগ্রহ করা সম্ভব, তার প্রায় সবগুলিই ইতিবাচক অর্থাৎ হ্যাঁ, জীবন আছে বহির্বিশ্বে। শুধু তাই নয়, তখনকার অভিমত এই ছিল যে, প্রতিটি গ্রহই বুদ্ধিমান জীব অধ্যুষিত। হয় তো সে বুদ্ধিমত্তার মাত্রার তারতম্য আছে। কিন্তু সে অন্য কথা। অথচ বিংশ শতাব্দীর গোড়ার অবস্থাটা একবার লক্ষ্য করা যাক। এই সময়ে দু একটি বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠী ছাড়া অধিকাংশেরই মত ছিল বহির্বিশ্বে জীবন থাকার সম্ভাবনা অকিঞ্চিৎকর, সে আমাদের নক্ষত্রলোক বা অন্যত্র যেখানেই হোক। আসল কথা, অন্য গ্রহে বা অন্য লোকে জীবন থাকার বিষয়ে, তার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের প্রতিষ্ঠায় বিজ্ঞানের যুক্তিতথ্য ততটা ছিল না, যতটা সক্রিয় ছিল আমাদের মনের সরল ইচ্ছা। স্বাভাবিক ধর্মই তাই, যুক্তিতথ্য যেখানে অকিঞ্চিৎকর সেখানে ব্যক্তিগত সংস্কারই সিদ্ধান্ত গঠনে প্রাধান্য লাভ করে।

বিষয়টিকে আধুনিক বিজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত করার প্রথম চেষ্টা সাম্প্রতিক কালে। এবং সাল তারিখের বিচারে ১৯৫০ এর পূর্বে তাকে কিছুতেই নিয়ে যাওয়া যায় না। বরং বলা যায়, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে স্যাটেলাইট স্পুটনিকের যুগের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে মানব তৎপরতা যেই অনন্ত শূন্যে পদচারণা শুরু করল, অমনি মহাকাশ গবেষণায় বহির্বিশ্বে জীবন, শুধু জীবন নয়, বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব বিজ্ঞানীমহলে বিতর্কের ঝড় তুলল।

নতুন আলোকে সেই পুরাতন প্রশ্নেরই পুনরাবৃত্তি, সেই একই জিজ্ঞাসার প্রতিধ্বনি, অনুরণন চলল। অনন্ত শূন্যে অন্য কোথাও মানুষের মত বুদ্ধিমান বা তার চেয়েও উন্নততর, অধিকতর নৈপুণ্যযুক্ত সৃষ্টিশীল আর কোনো জীব আছে ? না, এই সীমাহীন শূন্যলোকে আমরা নিঃসঙ্গ, এ বিশ্বপ্রপঞ্চে আমাদের কোনো প্রতিবেশী নেই, আমরা একাকী।

হয়তো আমাদের নক্ষত্রলোক কিম্বা আমাদের নক্ষত্রলোক ছাড়িয়ে

অন্ত কোথাও অন্য কোনো সূর্যের জীবনসম্ভাবনাময় গ্রহের বুদ্ধিমান অধিবাসীরা তারকাখচিত রাত্রির আকাশের দিকে তাকিয়ে একই প্রশ্ন করে চলেছে: অন্যত্র, একই লোকের অন্য গ্রহে বা অন্য কোনো লোকে বুদ্ধিমান জীবের সম্ভাবনা কতটা? তারাও হয়তো বলছে, আমরা কি একাকী?

যদি এমন দিন আসে যেদিন পরস্পরে যোগাযোগ স্থাপিত হবে, তাহলে প্রশ্নের সদুত্তরের ভেতর দিয়ে দুটি গ্রহেরই ইতিহাসে সেদিনটি সর্বোত্তমের সর্বোত্তম দিন হিসেবে চিহ্নিত থাকবে। বিজ্ঞানীরা সেদিনটির প্রত্যাশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। জানি না, সহযোগী গ্রহের ওঁরাও আছেন কি অনুরূপ শবরীর প্রতীক্ষায়!

আর যদি এমন হয়, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে একাধিক সভ্যতা পরস্পরের সঙ্গে ইতিমধ্যেই যোগাযোগ স্থাপন করেছে, তাহলে? অসম্ভব নয়। বরং সে যোগাযোগের আলোকে আমাদের একাকীত্ব একদিন ঘুচে যাবে আশা করা যায়। কিন্তু যতদিন না প্রশ্নের একটা সদুত্তর পাওয়া যায়, ততদিন চিরকালের প্রশ্নটি মানবচিন্তাকে আলোড়িত করে চলবে।

নভেম্বর, ১৯৬১ সাল। মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীমহল ওয়েস্ট ভারজিনিয়ার গ্রীণ ব্যাঙ্কে জাতীয় বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞান মানমন্দিরে মিলিত হলেন। আলোচনার বিষয়, বহির্বিশ্বে বুদ্ধিমান জীব। বিষয়টি খুবই অভিনব, চাঞ্চল্যকর। জনমানসে এ সম্পর্কে কি প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাবে আশঙ্কা ছিল, ফলে এই সভাটি অত্যন্ত গোপনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের যাবতীয় পরিমণ্ডলের গুণীজনেরা, ছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী, জীববিজ্ঞানী, পদার্থবিদ, দার্শনিক, রাসায়নিক। প্রত্যেকেই আপন আপন ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় এবং অনন্য। এঁদেরই মধ্যে একজন, নাম তাঁর কেলভিন, সভা চলার সময়ে রাসায়নশাস্ত্রে তাঁর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ পান।

এই জাতীয় বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা কেন আলোচনার বিষয়টিকে একান্ত বা গোপন রাখার চেষ্টা করেছিলেন? কে বলবে তার কারণ ইতিহাস

কি না। জিওর্দানো ব্রুনো, গ্যালিলিও এবং কোপারনিকাসের কথা মনে করা যাক। পৃথিবী সৌরজগতের কেন্দ্রে অবস্থিত নয়, এই সত্য প্রকাশের জন্য একদিন তাঁরা নির্যাতিত হয়েছিলেন। সমাজ এবং সভ্যতার কাছে তাঁদের বিচার ইতিহাসের এক মলিন চিত্র। বিংশ শতাব্দীতে সে ইতিহাস পুনরাবর্তিত হতে পারে না। তবু তাঁরা সতর্ক হয়েছিলেন। তা ছাড়া আরও একটি দিক আছে। যদি বিজ্ঞানী-সহযোগীদের কাছে উপহাস্যাস্পদ হতে হয়। যদি এই চিন্তাকে অবৈজ্ঞানিকোচিত বলে কেউ মনে করেন।

কিন্তু না, সে আশঙ্কাও অমূলক বলে প্রমাণিত হল। বরং অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করল ধীরে ধীরে। যা ছিল ব্যক্তি-বিশেষের চিন্তা-ভাবনায় বা গোষ্ঠীর আলোচনার পরিমণ্ডলে তা পরিব্যাপ্ত হল সকল স্তরে, সমস্ত সম্প্রদায়ে, ভিন্ন মনের দেশে দেশে।

বিজ্ঞানীরা সঙ্ঘবদ্ধ হলেন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব কয়েকটি সুস্পষ্ট প্রশ্নের আকারে রূপ নিল। মানব সভ্যতা, এ কী সমস্ত সৃষ্টিরহস্যের একটি পরিহাস বা ব্যতিক্রমমাত্র, নাকি কোটি কোটি উন্নত সভ্যতার একটি, যে সভ্যতা তার আপন সংস্কৃতি, দর্শন এবং রাজনীতিকে অবলম্বন করে স্বকীয়তায় ভাস্বর হয়ে রয়েছে। বলা যায় না, যদি এমন কোনো সভ্যতার অস্তিত্বের কোনোদিন পরিচয় পাওয়া যায়, তাহলে যে প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞানে আজ আমরা গ্রহান্তরের রহস্য উদ্ঘাটনে সক্ষম হয়েছি, হয়তো অন্য লোকবাসীর মহান্ আবিষ্কারের সঙ্গে তুলনায় সে তৎপরতাও সামান্য ও তুচ্ছ বলে প্রমাণিত হয়ে যেতে পারে। বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা আজ সম্মিলিতভাবে বলছেন, বুদ্ধিমান অন্য লোকবাসী থাকতে পারে, এমন কথা বলা যথেষ্ট নয়, বরং বলা যায়, অন্য লোকবাসীর সম্ভাবনা আছে এবং সে সম্ভাবনা খুব বেশি।

আজ এ কথা সবাই জানে যে, জীবন গড়ার মূল কাঠামোটুকু গবেষণাগারেই সংশ্লেষণ সম্ভব। অবশ্য তার জন্যে চাই অনুকূল পরিবেশ এবং সে পরিবেশ কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করতে হবে। যে

জৈব যৌগ থেকে আমাদের সৃষ্টি উল্কাপিণ্ডে এবং আন্তর্গ্রহ মহাশূন্যেও তা পাওয়া গেছে। গবেষণার সাফল্য আজ এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁচেছে যা সকলের কাছেই বিস্ময়কর। বহু লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে এই অনন্ত অসীম মহাশূন্যে যে সব তারা আছে সেগুলির আলোক বিশ্লেষণে এখন তাদের রাসায়নিক উপাদান নির্ণয় সম্ভব হয়ে এসেছে। এবং বিস্ময়ের কথা, এই সাফল্য সংশয়ের সকল সীমা অতিক্রম করেছে। শুধু তাই নয়, যেসব পরমাণুর সন্ধান পাওয়া যায় আমাদের এই ধরিত্রীর বুকে, আমাদের নক্ষত্রপুঞ্জ অতিক্রম করে আরও অনেক, অনেক দূরেও তাদের অস্তিত্বের খবর আছে।

তাহলে বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব শুধু এই পৃথিবীতে সম্ভব কেন? যেখানে এক একটি নক্ষত্রলোকে অজস্র তারকা এবং এক একটি তারকাকে ঘিরে গ্রহ সমাবেশ সম্ভব সেখানে পৃথিবী কেন একমাত্র ব্যতিক্রম? অথচ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে নক্ষত্রলোক সীমাহীন, সংখ্যায় তারা সহজগণন নয়। শস্যক্ষেত্রে কোটি কোটি বীজ বোনার পরে শুধু একটি বীজ থেকেই ফুল ফুটবে, ফল ধরবে তা কখনো হয়?

বিজ্ঞানীদের ধারণা, না ধারণা নয়, প্রত্যয় ব্রহ্মাণ্ডের অন্যত্র, অন্য লোকে জীবন আছে, জীবনের আদিরূপ বললে সব বোঝায় না, উন্নত জীবনযুক্ত বুদ্ধিমান জীব, হয়তো মানবসভ্যতার চেয়েও উন্নততর জীব বসবাস করছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জীবন সৃষ্টির রহস্য অনুসন্ধানের আগে আমাদের সৌরজগতের সৃষ্টি হল কি ভাবে, দেখা যাক। মহাশূন্যে গ্রহ এবং গ্রহাণুপুঞ্জের সুষম বিন্যাস এবং গতি লক্ষ্য করলে এ রকম একটা ধারণা করা নিশ্চয় অসঙ্গত নয় যে, এরা সবাই একটা পরিবারের অন্তর্গত এবং এই পরিবারের নাম সৌর পরিবার। একই ধরনের নিয়ম-শৃঙ্খলায় অভ্যস্ত ও সমরূপ বৈশিষ্ট্যযুক্ত গ্রহ এবং গ্রহাণুপুঞ্জ পরস্পর সম্পর্কশূন্য এমন কথা মনে করার কোনো কারণ নেই। কিন্তু সৌরজগতের এই গ্রহগুলির মধ্যে কী ধরনের সাদৃশ্য নজরে আসে?

সকল মুখ্য গ্রহই সূর্যের প্রায় নিরক্ষীয় তলে পরিক্রমণশীল। তবে প্লুটো গ্রহের পরিক্রমণ-পথ সূর্যের নিরক্ষীয় তলের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য কৌণিক ব্যবধান (১৭ ডিগ্রি) সৃষ্টি করে। যদি সূর্য আর সূর্য থেকে ক্রমবর্ধমান দূরত্বে অবস্থিত গ্রহদের ত্রিমাত্রিক মডেল তৈরী করা হয়, তাহলে তাদের একটি অগভীর প্যানের মধ্যেই বসানো যাবে।

সাধারণভাবে আর যে সব বিষয়গুলির ক্ষেত্রে সাদৃশ্য দেখা যায় তাদের মধ্যে আছে সূর্যকেন্দ্রিক আবর্তন, তাদের পরিক্রমণ-পথ, গ্রহদের আপন অক্ষকেন্দ্রিক আবর্তন প্রভৃতি। দেখা যায়, সকল মুখ্য গ্রহই একই দিক থেকে সূর্যকে একই দিকে আবর্তন করে—ধ্রুব নক্ষত্রের কোনো গ্রহের কোনো জীব যদি সৌর গ্রহমণ্ডলীকে লক্ষ্য করত তাহলে সে দেখতো, গ্রহগুলি সূর্যকে আক্ষরিক অর্থে 'প্রদক্ষিণ' করছে অর্থাৎ ক্লক-ওয়াইজ পাক খাচ্ছে। যেমন দক্ষিণ গোলার্ধের ক্যানোপাস নক্ষত্র থেকে মনে হবে গ্রহগুলি বামাবর্তে (এ্যান্টি ক্লক-ওয়াইজ) পাক খাচ্ছে। তাছাড়া গ্রহেরা যেমন সূর্যের চতুর্দিক দিয়ে প্রদক্ষিণরত, তেমনি আপন অক্ষের উপরেও গ্রহেরা আবর্তন করে

চলেছে। আহ্নিক-আবর্তনের দিক সূর্যকে পরিক্রমণ-দিকেরই অনুরূপ। ব্যতিক্রম অবশ্য আছে। তা হল শুক্র এবং ইউরেনাস। ইউরেনাসের নিরক্ষীয় তল তার আবর্তন-কক্ষের সঙ্গে প্রায় ৮২ ডিগরি কোণে অবস্থিত। অর্থাৎ ইউরেনাস তার কক্ষপথের উপরে চলেছে প্রায় গড়িয়ে গড়িয়ে। আরও আছে। বিভিন্ন গ্রহের উপগ্রহ, সাধারণভাবে বলা যায়, আপন আপন গ্রহের প্রায় নিরক্ষীয় তল দিয়ে আবর্তন করে চলে। এখানেই শেষ নয়। গ্রহদের আবর্তন পথের মধ্যেও সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। সে আবর্তন পথ উপবৃত্তাকার। আরও যে সব কারণের ভিত্তিতে গ্রহেরা একই সৌরপরিবারভুক্ত বলে মনে হয় তার মধ্যে আছে মহাশূন্যে তাদের অবস্থানের সান্নিধ্য। নিকটতম তারাটি সুদূরতম গ্রহ প্লুটোর দূরত্বের চেয়েও ৬০০০০০ গুণ দূরে অবস্থিত। এইসব দিকে তাকিয়ে মনে হয়, সৌরপরিবারের সদস্যদের উৎস একই। কোনো একটি প্রক্রিয়ায় কোনো একটি নিয়ম শৃঙ্খলার ভেতর দিয়েই তার সৃষ্টি হয়েছে। আর সেই সঙ্গে আর একটি সম্ভাবনার কথা, সে সম্ভাবনা যতই সামান্য হোক, উল্লেখ করতে হবে। সে হল মহাজাগতিক কোনো দুর্ঘটনা। আকস্মিক কোনো দৈব দুর্বিপাক। যদি সেই আকস্মিকতায় এই সৌরপরিবারের সৃষ্টি হয়!

১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট (Immanuel Kant) সৌরজগতের সৃষ্টি হল কি ভাবে, এ সম্পর্কে নতুন আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, সূর্য, গ্রহাদি তাদের উপগ্রহ এবং ধূমকেতু প্রভৃতির সৃষ্টি একটি নীহারিকা থেকে, পাতলা এবং মেঘের মতন একটি আস্তরণ অবলম্বনে। কান্টের এই মতবাদ কিন্তু বিজ্ঞানীমহলে তেমন কোনো আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি। কান্টের এই মতবাদের প্রায় ৪০ বছর পরে ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে একজন বিশিষ্ট ফরাসী গণিতবিদ্ ল্যাপলাস (Pierre Simon, Marquis de Laplace) একটি মতবাদ প্রচার করেন। এটি নীহারিকা তত্ত্ব নামে পরিচিত। কান্টের ধারণাকেই এই তত্ত্বের মধ্যে বিস্তারিতভাবে পরিবেশন করা হয়েছিল। কিন্তু ল্যাপলাস সম্ভবত কান্টের মতবাদ

সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। সুশৃঙ্খল ধারায় সৌরজগৎ উৎপত্তির ক্ষেত্রে এটিই প্রথম যুগান্তকারী তত্ত্ব যা শতাব্দীকাল মানবসভ্যতা সত্য হিসেবে মেনে নিয়েছিল। এই তত্ত্বে ল্যাপলাস চক্রের আকারের এক বিরাট শীতল মেঘপুঞ্জের কথা বলেন। এই মেঘপুঞ্জ ধীরে আবর্তনরত এবং ব্যাপ্তিতে এ দূরতম গ্রহের কক্ষপথকেও অতিক্রম করে গিয়েছে। এর বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণে যখন মেঘপুঞ্জ সঙ্কুচিত হয়ে আসছিল, তখন এর আবর্তন গতিও দ্রুততর হচ্ছিল।

একদিকে সঙ্কোচন, অন্যদিকে গতিবৃদ্ধি —এর কারণ কী?

কারণের কথা বলতে গেলে একটি নতুন সংজ্ঞা এখানে নিয়ে আসতে হয়। এটি হল কৌণিক ভরবেগ (Angular Momentum)। কৌণিক ভরবেগের আগে শুধু ভরবেগের কথা। কোনো বস্তুর ভর (Mass) এবং বেগের (Velocity) গুণফলই হল ভরবেগ। একটি কেন্দ্রের চারপাশে ঘুরে চলেছে এ রকম একটি বস্তুর কথা যদি ধরা যায়, তাহলে তার ভরবেগ হবে ভর, বেগ এবং কেন্দ্র থেকে এর দূরত্ব পর্যন্ত ব্যাসার্ধের গুণফল। কোনো একটি বদ্ধ প্রক্রিয়ায় (Closed circuit) কৌণিক বেগের পরিবর্তন হয় না। যদি ধরা যায় সঙ্কোচনে ব্যাসার্ধ হ্রাস পায়, অনুপাতে গতিবেগ বর্ধিত হয়, তাহলে ফলস্বরূপ গুণফল অপরিবর্তিত থাকে।

এই সৌরজগৎ সৃষ্টির ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণে যখন মেঘপুঞ্জ সঙ্কুচিত হয়ে আসছিল, গতিবেগের হার বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তাই-ই স্বাভাবিক। দুই হাত দুদিকে বিস্তৃত করে যদি কেউ নিজের চারদিকে লাট্টুর মত ঘোরে, তখন সে যতটা জোরে ঘুরবে, দুই হাত গুটিয়ে নিলে তার ঘোরার বেগটা এক থাকবে না। সে যাবে বেড়ে। মেঘপুঞ্জের সঙ্কোচনের ক্ষেত্রে সে বৃদ্ধির পরিমাণ এতটা যে মেঘপুঞ্জের পরিধির উপরে কেন্দ্রাতিগ বল মাধ্যাকর্ষণকে ছাড়িয়ে যায়। সেই কারণে মূল মেঘপুঞ্জ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসে বলয়ের আকারের বস্তু-খণ্ড। সঙ্গে সঙ্গে কৌণিক ভরবেগ কিছুটা হ্রাস পায় এবং অবশিষ্ট

পদার্থের গতি আবার মন্থরতা লাভ করে। এইভাবে আরও সঙ্কোচন এবং সেই সঙ্গে আরও বস্তুপিণ্ডের নির্গমন। সৃষ্টির প্রাক্কালে সঙ্কোচন যতই চলতে লাগল, কেন্দ্র থেকে ততই বিভিন্ন বস্তুপিণ্ড বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করল। ওই বস্তুপিণ্ডই কালক্রমে ঘনীভূত হয়ে গ্রহ হিসেবে আকার লাভ করে। গ্রহের আকারে রূপান্তর লাভ করার সময়ে একই পদ্ধতিতে ওই বলয়গুলি থেকে আবার ছোট ছোট বলয় উৎপন্ন হয়। গ্রহকে আবর্তনরত এই বলয়গুলি তাদের উপগ্রহ। ল্যাপলাসের নীহারিকাবাদ বিজ্ঞানের ইতিহাসে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য মতবাদ। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে এই মতবাদ প্রচলিত ছিল। এবং শতাব্দীকাল এই তত্ত্বটি নিয়ে কোনোরকম মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়নি। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে বিজ্ঞানীরা এই তত্ত্বটির ক্ষেত্রে অসঙ্গতি লক্ষ্য করেন। এই অসঙ্গতি প্রধানত কৌণিক ভরবেগ সংক্রান্ত। সৌরপরিবারে কৌণিক ভরবেগের বিতরণ যদি লক্ষ্য করা যায়, তাহলে তার অসম বন্টন বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমগ্র সৌরজগতে গ্রহগুলির ভরের পরিমাণ কতটুকু? আনুপাতিক হিসাবে ভর শতকরা ১ ভাগেরও কম। অথচ কৌণিক ভরবেগের শতকরা ৯৮ ভাগই আছে ওদের মধ্যে। এই ব্রহ্মাণ্ডে স্বাভাবিকভাবে যেখানে এই গ্রহজগতের সৃষ্টির কথা কল্পনা করা হয়, সেখানে কৌণিক ভরবেগের এ রকম অসম বন্টন বিজ্ঞানীরা মেনে নিতে পারেন না। কৌণিক ভরবেগ ছাড়া আরও একটা ব্যাপার আছে। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল শনির বলয়কে বিশ্লেষণ করেন গাণিতিকভাবে। কোনো বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসা গ্যাসীয় পদার্থের কখনোই কঠিন পদার্থে রূপান্তরিত হওয়ার কথা নয়। অতএব কোনো বিস্তৃত নীহারিকা থেকে এই গ্রহজগতের সৃষ্টি হয়নি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকাই তাকে সৃষ্টি করেছিল।

তাহলে? ল্যাপলাসের নীহারিকা মতবাদ যদি কৌণিক ভরবেগের অসম বন্টনের প্রশ্নটির যথোচিত উত্তর দিতে না পারে? যদি সে কঠিন বস্তুপিণ্ড গঠনের সঙ্গত কারণ উপস্থাপনে ব্যর্থ হয়?

বিংশ শতাব্দীর সূচনায় ল্যাপলাসের নীহারিকা মতবাদ অবলুপ্ত হল। সুশৃঙ্খল এক ধারা অবলম্বনে সৌরজগৎ সৃষ্টির যে কথা বিজ্ঞানীরা এক শতাব্দীকাল ধরে ভেবে আসছিলেন বিজ্ঞানীসমাজ সেই মতবাদকে বর্জন করলেন। আকস্মিকতার ভেতর দিয়ে সৌর-জগতের সৃষ্টির ধারণাটি পুনরুজ্জীবিত হল। বিজ্ঞানীরা চিন্তা করলেন গ্রহগুলিতে যে কৌণিক ভরবেগের আতিশয্যের কোনো সদুত্তর পাওয়া যাচ্ছিল না, বহিঃস্থ কোনো কারণে হয়তো সেই বিপুল পরিমাণ কৌণিক ভরবেগ এসেছিল ; তারকার সঙ্গে সংঘর্ষে বা প্রায় সংঘর্ষে। এ আকস্মিক এক দুর্ঘটনা। না, দুর্ঘটনা বলব না, দুর্ঘটনা স্বাভাবিক-ভাবেই মলিন। একে আখ্যা দেওয়া যায় মহাদুর্ঘটনা। প্রায় ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে জ্যোতির্বিজ্ঞানী মোলটন (Forest Ray Moulton) এবং ভূতত্ত্ববিদ্ চেমবারলিন (T. C. Chamberlin) একটি নতুন মতবাদ প্রচার করেন। এই মতবাদে তাঁরা একটি দ্রুত ধাবমান তারকার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, কোনো আকস্মিকতায় এই তারাটি সূর্যের অত্যন্ত কাছাকাছি এসে পড়ে এবং গা ঘেঁসে বেরিয়ে যায়। তারকার মহাকর্ষীয় টানে সূর্যের দেহে তখন জোয়ারের মত বিপুল তরঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং শুধু যে জোয়ারের মত বিপুল তরঙ্গ ফুলে ফেঁপে ওঠে তা নয় সেই সঙ্গে এই তারকার অভিকর্ষের প্রভাবে সূর্য থেকে গ্যাসীয় পদার্থ বিচ্ছিন্ন হয়ে আসে। এর কিছুটা অংশ মহাশূন্যে অন্য তারকাটিকে অনুসরণ করে চলে যায়। অন্য অংশটি সৌর-আকর্ষণে সূর্যকে কেন্দ্র করে আবর্তন শুরু করে, পরে তা শীতল হয়ে ঘনীভূত হয় এবং অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহে রূপান্তর লাভ করে। এইগুলি পরে ঘন-সন্নিবদ্ধ হয়ে সৃষ্টি করে আমাদের গ্রহমণ্ডলী।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে এই তত্ত্বটিরও সংস্কার সাধন করেন দুই বৃটিশ-বিজ্ঞানী জীন্‌স (Sir James Jeans) এবং জেফ্রিস (H. Jeffreys)। মোলটন এবং চেমবারলিনের তত্ত্বের সঙ্গে তাঁদের মূল পার্থক্য এইখানে যে, মোলটন এবং চেমবারলিন অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ ঘন

সন্নিবদ্ধ হয়ে গ্রহপুঞ্জ গড়ে উঠেছিল বলে কল্পনা করেন, কিন্তু জীন্স্ এবং জেফ্রিস বলেন, তা নয়, বাইরের তারকার অভিকর্ষের প্রভাবে সূর্য থেকে অনেকটা সিগার আকৃতির একটি লম্বাটে গ্যাসীয় পিণ্ড বেরিয়ে চলে আসে। এই গ্যাসীয় পিণ্ডের মধ্যবর্তী অংশ সবচেয়ে স্থূল এবং দুটি প্রান্তভাগ অপেক্ষাকৃত শীর্ণ। এই গ্যাসীয় পিণ্ড থেকে সরাসরি গ্রহগুলি গড়ে ওঠে, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহের ঘন সন্নিবেশ হিসেবে নয়। গ্রহজগতের বৃহত্তর গ্রহগুলি সৃষ্টি হয়েছিল গ্যাসীয় পিণ্ডের মধ্যবর্তী অংশ থেকে, যেমন বৃহস্পতি এবং শনি; কনিষ্ঠতর গ্রহগুলি প্রান্তভাগ থেকে।

তত্ত্বটি আপাতদৃষ্টিতে যতই গ্রহণযোগ্য হোক, গণনায় দেখা গেল, বিচ্যুত গ্যাসীয় পিণ্ডের সূর্যের চারদিকে ঘোরার কথা নয়, বরং অসীম মহাশূন্যে তারকাটিকে অনুসরণ করেই এটির চলা উচিত।

এই তত্ত্বটির ক্ষেত্রে যে সব অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়, সেগুলিকে দূর করার জন্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানী লিটলটন (R. A. Lyttleton) সংঘাত তত্ত্বের আর একটু সংস্কারসাধন করেন। তিনি সূর্যকে একটি তারা হিসেবে না ধরে দ্বৈত তারকা মনে করলেন। এবং বললেন, যে সংঘাত হয় তা মূল সূর্যের সঙ্গে না হয়ে হল সূর্যের সঙ্গীর সঙ্গে। কিন্তু নানা কারণে এই তত্ত্বও গ্রহণযোগ্য নয়। সংঘাত-তত্ত্বের ক্ষেত্রে অন্যান্য মতবাদের তুলনায় লিটলটনের মতবাদ সৌরজগৎ সৃষ্টির একটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য মতবাদ। তাহলেও সংঘাত-তত্ত্বের ক্ষেত্রে সবচেয়ে যা বেশি অসম্ভব বলে মনে হয়, তা দুটি তারকার মধ্যে সংঘাত বা প্রায়-সংঘাত। মহাশূন্যে যে কোনো দুটি তারকা এমনই ব্যবধানে অবস্থিত যে তাদের মধ্যে সংঘাতের কোনো সম্ভাবনা একেবারে নেই বললেই চলে।

ফলে সৌরজগতের উৎপত্তি বিষয়ে আধুনিক মতবাদ এই সংঘাত প্রক্রিয়াকে গ্রহণ করেনি। নীহারিকা মতবাদে যা লক্ষ্য করা যায় আধুনিক মতবাদেও সে রকম, সূর্যকে একটি শীতল এবং বিস্তৃত গ্যাসীয় পিণ্ড হিসেবে কল্পনা করা হয়। বিজ্ঞানীরা আবার ফিরে এলেন

সুশৃঙ্খল ধারায় সৃষ্টির পরিমণ্ডলে। সেই নীহারিকা মতবাদের সংস্কার-সাধনের ভেতর দিয়ে সৃষ্টি রহস্যের সমাধান সম্ভব হবে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করলেন। বিশাল একটি গ্যাসীয় পিণ্ড, সে বিশালাকৃতি পিণ্ডে নিশ্চয় তরঙ্গের সৃষ্টি হবে ঃ সে তরঙ্গ ভেঙ্গে পড়বে, আবার গড়ে উঠবে। এই ভাঙ্গা-গড়া সমানে চলবে। অবশেষে এই পিণ্ডটি অনেকগুলি খণ্ডে বিভক্ত হবে এবং এগুলি প্রত্যেকটি ঘনীভূত হয়ে পৃথক জগৎ সৃষ্টি করবে। কেন্দ্রীয় বস্তুটি তখনও শীতল ; কিন্তু ধারা-বাহিক সঙ্কোচনে তা অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠবে এবং বিকিরণ সক্ষম হবে। এই বিকিরণের ফলে বিভিন্ন গ্রহের বস্তুপিণ্ডের অনেকখানিই বাষ্পীভূত হয়ে মহাশূন্যে বিলীন হবে। আধুনিক এই তত্ত্বটিতে কৌণিক ভরবেগের সমস্যাটি কিন্তু এড়িয়ে যাওয়া যায়।

যাই হোক, সৌরজগতের উৎপত্তি বিষয়ক কোনো তত্ত্বই এখনও সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে নি।

নীহারিকা মতবাদের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য তত্ত্ব পরিবেশন করেন জারমান জ্যোতির্বিদ্ উইজস্যাকার (C. Von Weizsaecker)। তখন ১৯৪৪ সাল। বিজ্ঞানের গবেষণায় তখন ব্রহ্মাণ্ডের আরও প্রসার ঘটেছে, সে আরও বিস্তীর্ণ, আরও পরিব্যাপ্ত হয়েছে।

ল্যাপলাসের সৌরমণ্ডল সৃষ্টির সময়ে যে মেঘের কল্পনা করা হয়েছিল, এখন সে মেঘ আরও বিশাল, আরও বিরাট। উইজস্যাকার মনে করেন, গ্যাসীয় স্তরের একটি আস্তরণ প্রাথমিক সূর্যের নিরক্ষীয় প্রদেশ দিয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে অবস্থান করছিল। সূর্যের বহিরাবরণরূপে এই যে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত গ্যাসীয় স্তর, কেপলারের সূত্র অনুসারে এ ছিল সূর্যকে কেন্দ্র করে আবর্তনরত এই আস্তরণের প্রায় শতকরা ৯৯ ভাগই ছিল হাইড্রোজেন এবং হিলিয়ামের মত হাল্কা পদার্থ। ঘটনাক্রমে সৌরবিকিরণে এবং উত্তাপে হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম মুক্ত হল, পড়ে রইল সব ভারি পদার্থ। একই সঙ্গে চলল গ্রহদের গড়ে ওঠার কাজ। কী ভাবে সে কাজ

সম্পন্ন হল ?

যুক্তিটা এইরকমভাবে উপস্থাপন করা হল : সূর্য থেকে যে সব কণিকা অপেক্ষাকৃত দূরে আছে তাদের আবর্তনের গতিবেগ এবং নিকটে অবস্থিত কণিকাগুলির গতিবেগের পার্থক্যের জন্যে ও সেই সঙ্গে কণিকাগুলির পারস্পরিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফলে নীহারিকার মধ্যেই কিছু কোষাকৃতি সংগঠিত হবে। প্রতিটি কোষের মধ্যেই বস্তু আবর্তন করে চলবে ঘড়ির কাঁটার অভিমুখীন দিকে কিন্তু সমস্ত নীহারিকাটির আবর্তন চলবে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতমুখীন লক্ষ্যে। সন্নিহিত কোষগুলির মধ্যে এখন কিছুটা জায়গার (Pocket) সৃষ্টি হবে। ঘড়ির কাঁটার অভিমুখীন দিকে আবর্তনরত কোষগুলির বাইরে এদের বিপরীতমুখীন গতিবেগ। এইগুলিই গ্রহ হিসেবে পরিণত হয়ে উঠবে।

উইজস্যাকারের নীহারিকা মতবাদ-নির্ভর তত্ত্ব বিজ্ঞানীদের অনেক প্রশ্নের সদুত্তর দেয়; কিন্তু এখনও তা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি।

নীহারিকা মতবাদ-নির্ভর আরও কিছু কিছু তত্ত্ব পরিবেশন করেন অন্য কয়েকজন বিজ্ঞানী। এদের মধ্যে আছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ক্যুপার (G. P. Kuiper), আছেন হুইপল (Fred. L. Whipple)। এঁদের কারোর তত্ত্বই সম্পূর্ণভাবে সন্তোষজনক নয়। এবং এ কথা ঠিক যে, সৌরজগতের সৃষ্টি সংক্রান্ত কোনো তত্ত্বই এখনও সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি।

তবু, সৌরজগৎ আছেই। যে কোনো প্রণালীতেই সে সৃষ্টি হোক, সৃষ্টি তার ঘটেছে এবং সে বর্তমান। যদি আকস্মিকতাবিহীন, ক্রম-বিবর্তনের ধারা অবলম্বনে এই সৃষ্টি হয়ে থাকে কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে, তাহলে আমাদের নক্ষত্রলোকে অসংখ্য গ্রহজগৎ থাকা সম্ভব। হয়তো বা প্রতিটি নক্ষত্রেরই। সেই অসংখ্য গ্রহজগতের মধ্যে জীবন এবং বুদ্ধিমান জীব থাকার সম্ভাবনা যে অত্যন্ত উজ্জ্বল, এমন কথা কখনও অস্বীকার করা চলে না।

তৃতীয় অধ্যায়

সৌরজগৎ থেকে এইবার আমরা মর্ত্যলোকে নেমে আসি। সৌরজগৎ এবং এই সৌরজগতের মধ্যে আমাদের পৃথিবী তো সৃষ্টি হল যে কোনো কৌশলে।

কিন্তু এই বিশ্বে জীবনের সৃষ্টি হল কি করে? কোন্ ধারাবাহিকতায় মানুষ আজ মানুষ হয়ে উঠেছে, বুদ্ধিমান, সভ্য এবং উন্নত জীব হিসেবে নিজেকে সে প্রতিষ্ঠিত করেছে? বহির্বিশ্বে বুদ্ধিমান জীবের অনুসন্ধানে পৃথিবীর বুকে জীবন সৃষ্টির সকল রহস্য উন্মোচন একান্ত আবশ্যক।

পৃথিবীতে জীবনের সৃষ্টি, প্রাথমিক ধারণায়, এ ছিল আকস্মিক এবং এক দুর্ঘটনা মাত্র। সেই দুর্ঘটনায় জীবন সৃষ্টি হল স্বতঃস্ফূর্তভাবে। এই আকস্মিকতা এবং দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমাদের গ্রহের বাইরে অন্য কোথাও জীবনের অস্তিত্ব নিয়ে কোনো তত্ত্বের উপস্থাপন সম্ভব নয়। ব্যতিক্রম শুধু সম্ভাবনার দিকটি। কিন্তু মানসিক পরিতৃপ্তির ক্ষেত্রে তার কতটুকু মূল্য আছে?

অবশ্য বর্তমানে জীবনের এই সৃষ্টিকে বিজ্ঞানীরা আকস্মিক বলে অভিহিত করেন না। বরং এই গ্রহের বুকে জীবনের সৃষ্টি, বিকাশকে যুক্তি এবং বিজ্ঞান অবলম্বন করে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করে চলেছেন তাঁরা। সৃষ্টি রহস্যের সে ব্যাখ্যা আমাদের পৃথিবীর উৎপত্তির সাধারণ ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যদি প্রকৃতির নিয়ম বিশ্ব চরাচরে পরিব্যাপ্ত বলে আমরা গ্রহণ করি, তাহলে ব্রহ্মাণ্ডের অন্যত্র, অন্য গ্রহেও জীবন সৃষ্টির একই পর্যায়গুলি অনুসৃত হবে।

প্রাচীন পৃথিবীর দার্শনিকেরা এবং বিজ্ঞানীরা জীবনের সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত জনন সংক্রান্ত চিন্তাকেই সাধারণভাবে গ্রহণ করেন।

যদি দেখা যেত, অজৈব পচনশীল কোনো বস্তুর মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে পোকারা, তখন মনে হত পচনশীল ওই বস্তু থেকেই জীবনের সৃষ্টি, ওদের উদ্ভব স্বতঃস্ফূর্তভাবে। প্রথম যাঁরা স্বতঃস্ফূর্ত জননের কথা উল্লেখ করেন তাঁদের মধ্যে গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রীঃ পূঃ) একজন। এই প্রসঙ্গে তিনি যে অভিমত ব্যক্ত করেন, তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, সকল জীবনের সৃষ্টি অজৈব বস্তু থেকে। জীবন সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি এটিই যুক্তিগ্রাহ্য ধারণা বলে মনে করেন। পরবর্তীকালে ডে কার্তে, (১৫৯৬-১৬৫০) হার্ভে এবং নিউটন (Isaac Newton) (১৬৪৩-১৭২৭) জীবনশূন্য বস্তু থেকে স্বতঃস্ফূর্ত জননের তত্ত্বটি সংশয়াতীত ভাবে মেনে নেন।

বিজ্ঞানীদের এই অনেকটা একমুখী সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও জীবনের উৎপত্তি সংক্রান্ত বিতর্ক স্তব্ধ হল না। ইতিমধ্যে যখন স্বতঃস্ফূর্ত জনন সংক্রান্ত তত্ত্ব সাধারণভাবে গৃহীত হয়েছে, তখন ফ্রানসিসকো রেডি নামে একজন ইতালীদেশীয় চিকিৎসক পচনশীল বস্তু থেকে জীবনের সৃষ্টি হয় কি না পরীক্ষা করে দেখবার সিদ্ধান্ত করেন। ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দ। প্রচলিত বিশ্বাসের সত্যতা নির্ধারণের জন্যে তিনি কয়েকটি পাত্রের মধ্যে মাংসখণ্ড রাখলেন। পাত্রগুলি সব উন্মুক্ত রইল না। তিনি গজের সাহায্যে কয়েকটি পাত্র বন্ধ করে দিলেন। কৃমিকীট কি সবগুলি পাত্রেই জন্ম নিল ? না, তা নয়। প্রচলিত বিশ্বাসকে খণ্ডন করে সর্বপ্রথম লক্ষ্য করা গেল যে, কৃমিকীট জন্ম নিল কেবল সেই সব পাত্রে যেগুলি ছিল উন্মুক্ত। রেডি তাঁর সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন। তিনি বললেন, কৃমিকীটের জন্ম উন্মুক্ত পাত্রগুলিতে, মক্ষিকাপ্রসূত ক্ষুদ্র ডিম থেকেই, অজৈব কোনো বস্তু থেকে নয়।

অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হল। এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ রেখে মানুষের দৃষ্টির সম্মুখে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণীর একটি জগৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। জীবজগৎ সম্পর্কে যে ধারণা ছিল কেবল খালি চোখে প্রত্যক্ষ করা প্রাণীর ক্ষেত্রে তা আরও পরিব্যাপ্ত হল। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত জননের স্বপক্ষে আর তেমন যুক্তিগ্রাহ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা হতে দেখা গেল না।

এমন এক সময়ে ফরাসী অ্যাকাডেমি একটি পুরস্কার ঘোষণা করলেন। বিষয় ঃ বৈজ্ঞানিক জগতে বহু বিতর্কিত জীবনের উৎপত্তি সংক্রান্ত বিষয়টির উপরে আলোকপাত। ফরাসী অ্যাকাডেমির এই প্রাইজটি দেওয়া হয়েছিল লুই পাস্তুরকে। ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণলব্ধ ফলের উপরে তিনি একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। কয়েকটি সুসংঘটিত পরীক্ষায় তিনি প্রত্যক্ষ করেন যে, জৈব পদার্থের পারস্পরিক বিভিন্ন মিশ্রণেও জীবাশ্মের উৎপত্তি কিছুতেই সম্ভব নয়।

পাস্তুর তাঁর গবেষণায় এক ধরনের ফ্লাস্ক ব্যবহার করেন। এই ফ্লাস্ক হাঁসের আকৃতির মত একটি নলযুক্ত। এই জাতীয় একটি নল ব্যবহারের কারণ কী? নলের বৈশিষ্ট্য এই যে, নলের খোলা মুখ দিয়ে ফ্লাস্কের মধ্যে বাতাস প্রবেশ করতে পারবে, কিন্তু ধূলিকণা বা জীবাণু নয়। সেখানে ফ্লাস্কের নল অনেকটা ছাঁকনির মত কাজ করবে। পাস্তুর ফ্লাস্কে মণ্ড রেখে ফুটিয়ে নিলেন। উদ্দেশ্য ফ্লাসকটিকে জীবাণুশূন্য করা। মণ্ডটি জীবাণুশূন্য রইল, সন্দেহ নেই। যদি জনন হয় স্বতঃস্ফূর্ত, তাহলে এই মণ্ডতেই জীবনের লক্ষণ দেখা দেওয়ার কথা। কিন্তু না, জীবনের কোনো লক্ষণ সেখানে ফুটে উঠল না। পাস্তুরের গবেষণার বিভিন্ন দিক থেকে এ কথা বোঝা গিয়েছিল যে, উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা স্বতঃস্ফূর্ত জনন সংক্রান্ত তত্ত্বকে যেভাবে গ্রহণ করেছিলেন, সেভাবে গ্রহণ করার কোনো অর্থ হয় না। কিন্তু সেখানেই এর শেষ নয়। কয়েকজন বিজ্ঞানী তখনও ছিলেন যাঁরা তাঁদের ধ্যান ধারণা অনুযায়ী স্বতঃস্ফূর্ত জনন সংক্রান্ত তত্ত্বটি আঁকড়ে ধরেছিলেন। কিন্তু পাস্তুরের একজন ঘোর সমর্থক ছিলেন টিনডাল (Tyndall)। তিনি সেই সব বিজ্ঞানীদের অবৈজ্ঞানিক ধারণা খণ্ডন করবার চেষ্টা করেন।

জীবনের উৎপত্তি বিষয়টিকে যিনি প্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখেন, তিনি হলেন চার্লস ডারউইন। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তিনি সর্বপ্রথম বিবর্তনবাদী তাঁর বৈপ্লবিক তত্ত্বটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটান। তাঁর বক্তব্য এই যে, আজ প্রাণিজগতের যত

বিভিন্নতা এবং যত বৈচিত্র্যই আমাদের নজরে আসুক না কেন, তা এসেছে বিবর্তনের পথ ধরে। সৃষ্টির সূচনায় একটি মাত্র প্রাণ, তারপর বিবর্তনের ধারাবাহিকতা। কিন্তু পৃথিবীর বুকে সেই প্রাণটির আবির্ভাব হলই বা কেমন করে?

যুগ যুগ ধরে জীবনের উৎপত্তি বিষয়ে কয়েকটি তত্ত্ব প্রচলিত হয়েছিল দেখা যায়। সেগুলির মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী তেমন লক্ষ্য করা যায় না।

পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি বিষয়ক একটি তত্ত্ব আরহেনিয়াসের (Arrhhenius)। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী আরহেনিয়াস (১৯০৮) বিশ্বাস করতেন জীবনের বীজ গ্রহান্তর থেকেও আসতে পারে। এটি Theory of panspermia নামে অভিহিত। এই তত্ত্ব অনুসারে সৌর বিকিরণের ক্ষমতা মহাবিশ্বের অসীম শূন্যতার ভেতর দিয়ে প্রাণের বীজ উড়িয়ে নিয়ে এল, উড়ে এসে নামল এক উর্বর জমিতে যেখানে আবার জীবন নতুন করে বিকাশ লাভ করল। তারা ধূলিকণাকে অবলম্বন করে আসতে পারে, আসতে পারে উল্কাপিণ্ডকে বাহন করে, যারা নিঃসীম মহাশূন্যে দুরন্ত গতিতে ছুটে চলে। এটা খুবই অস্বাভাবিক যে, এইসব অণুজীবীরা প্রায় সম্পূর্ণ শূন্যতার ভেতর দিয়ে সূর্যের অতিবেগনী রশ্মির আক্রমণ অতিক্রম করে আসতে সক্ষম হবে, সীমাহীন দূরত্ব পার হয়ে আসবে, যথেষ্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছাড়াই। ইউরেনাস, নেপচুনের মত পৃথিবী যদি সৌরজগতের সুদূরপ্রান্তে অবস্থান করত, তাহলে সূর্যের অতিবেগনী রশ্মির তীব্রতা কম অনুভূত হত, কিন্তু পৃথিবীর ক্ষেত্রে তা নয়। তা ছাড়া যদিও বা Theory of panspermia অনুসারে জীবনের বীজ মহাজাগতিক এই যাত্রার ঝঞ্ঝাট সহ্য করতে পারে, তবুও আর একটা প্রশ্ন থেকে যায়! অন্য গ্রহেই বা জীবন সৃষ্টি হয়েছিল কি ভাবে?

বহির্বিশ্বে বুদ্ধিমান জীব আছে, এই তত্ত্বের পৃষ্ঠপোষক কার্ল সাগান অবশ্য আরহেনিয়াসের এই ধারণাকে গ্রহণ করার তেমন কোনো যুক্তি দেখেন নি। পৃথিবীতে জীবন সৃষ্টি কিভাবে হয়েছিল এ

বিষয়ে বিজ্ঞানীমহলে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য তত্ত্ব পরিবেশন করেন সোভিয়েট প্রাণরসায়নবিদ্ আলেকজান্দার আইভানোভিচ ওপারিন (Alexander Ivanovich Oparin)। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ওপারিন একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। জীবন সৃষ্টির ক্ষেত্রে আধুনিক প্রায় সকল তত্ত্বের মূল হিসেবে পুস্তিকায় প্রকাশিত তাঁর বক্তব্যকে গ্রহণ করা যায়। যখন ওপারিন এই পুস্তিকায় তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেন তখন আধুনিক প্রাণিবিদ্যা বিশেষ করে আণবিক প্রাণিবিদ্যা এবং প্রাণরসায়নবিদ্যা তাদের প্রাথমিক অবস্থায় ছিল।

ওপারিনের বক্তব্য, পৃথিবীর আদি বায়ুমণ্ডলে ছিল মিথেন, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন এবং জলীয় বাষ্প।

ওপারিন তাঁর পুস্তিকায় বলেন, জীবনযুক্ত কোনো প্রাণী এবং জীবনহীন কোনো বস্তুর মধ্যে মূলগত কোনো পার্থক্য নেই। অনুকূল অবস্থায় প্রাণহীন বস্তু থেকেই প্রাণের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। এই দিক দিয়ে জীবনকে বস্তুর বিকাশের ফলস্বরূপই কল্পনা করা যায়। এটা এমন একটা সত্য, অতীতে যার উপস্থিতির কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না এবং আমাদের গ্রহের নিরবিচ্ছিন্ন ইতিহাসের একটি পর্বে যার সূচনা হয়েছিল। জীবনের উৎপত্তি এমন একটা ঘটনা যা নির্দিষ্ট কোনো স্থানের বা কোনো বিশেষ সময়ের বলে চিহ্নিত করা চলে না। বরং বলা যায়, যেন এ পৃথিবীর বুকে অতি দীর্ঘকাল ধরে সক্রিয় একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার ফল। এ যেন লক্ষ কোটি বছর ধরে পরিব্যাপ্ত পৃথিবীর মাটিতে সৃষ্টি এবং বিকাশের পরিণতি, যাকে আজ আমরা চূড়ান্ত অবস্থায় পর্যবেক্ষণ করি। এই যে প্রগতি, একে সুস্পষ্টভাবে পর্যায়ভুক্ত করা চলতে পারে : অজৈব থেকে জৈব এবং জৈব থেকে প্রাণসংক্রান্ত। ওপারিনের গবেষণার পরে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ প্রাণিবিজ্ঞানী হলডেন একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। তাঁর গবেষণার সঙ্গে ওপারিনের গবেষণার অনেকটা সাদৃশ্য ছিল। কিন্তু উভয়ের গবেষণাই পরস্পর নিরপেক্ষভাবে ঘটেছিল। পার্থিব জীবনের ক্ষেত্রে যে যে শর্তগুলি প্রয়োজন সেই সব শর্তগুলি নিয়ে

তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন। সূর্যের থেকে যে অতিবেগনী রশ্মি পৃথিবীতে এসে পৌঁচেছে তিনি সেই অতিবেগনী রশ্মির উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

ওপারিন যেখানে পৃথিবীর আদি বায়ুমণ্ডলের উপাদান হিসেবে মিথেন, অ্যামোনিয়া, জলীয় বাষ্প এবং হাইড্রোজেনের কল্পনা করেন সেখানে হলডেনের বক্তব্য, পৃথিবীতে আদি বায়ুমণ্ডল গড়ে উঠেছিল অক্সিজেন ব্যতিরেকে ; অ্যামেনিয়া, কারবন ডাই-অক্সাইড এবং জলীয় বাষ্পের সমবায়ে। পৃথিবীর আদিম অবস্থায় যে ভিন্ন ভিন্ন বায়ুমণ্ডলের কথা ওপারিন এবং হলডেন বলেছেন, উপাদানের দিক দিয়ে দেখতে গেলে ওই দুই বায়ুমণ্ডল পুরোপুরি অসমঞ্জস নয়। ওপারিন যে বায়ুমণ্ডলের কথা বলেন, তাতে দেখা যায়, বায়ুমণ্ডলে ছিল হাইড্রোজেন মিশ্রিত গ্যাস, অ্যামোনিয়ায় নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন, মিথেনে কারবন এবং সেই হাইড্রোজেনই। এ ছাড়া জলীয় বাষ্পে আছে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন। হলডেন যে বায়ুমণ্ডল কল্পনা করেন তাতে আছে অ্যামোনিয়া অর্থাৎ নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন, কারবন ডাই-অক্সাইড অর্থাৎ কারবন এবং অক্সিজেন এবং জলীয় বাষ্প বা হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিলন। হলডেন মনে করেন কারবন ডাই-অক্সাইড, অ্যামোনিয়া ও জলীয় বাষ্পের মিশ্রণের উপর সূর্যের অতিবেগনী রশ্মি এসে যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায় তার ফলেই প্রাণসৃষ্টির উপযোগী প্রাথমিক উপাদানের সংশ্লেষণ সম্ভব হয়েছিল।

হলডেনের এই তত্ত্বটি অবলম্বন করে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হল বিজ্ঞানীমহলে, তাতেও হলডেনের বক্তব্যের যাথার্থ্য লক্ষ্য করা গেল। গবেষণাগারে প্রমাণিত হল যে, কারবন ডাই-অক্সাইড, অ্যামোনিয়া ও জলীয় বাষ্পের উপরে সূর্যের অতিবেগনী রশ্মির যে ক্রিয়া বিক্রিয়া, তার ফলে জৈব মৌলিক পদার্থের উৎপত্তি। এই মৌলিক জৈব পদার্থের মধ্যে আছে অ্যামাইনো অ্যাসিড।

পৃথিবীর প্রাথমিক অবস্থায়, প্রাথমিক আবহমণ্ডলে জৈব পদার্থের উদ্ভব কি সম্ভব ? এ দিকে একটি উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা করেন স্টানলি

মিলার ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে। পৃথিবীর প্রাথমিক আবহমণ্ডলের বিভিন্ন উপাদান অ্যামোনিয়া, মিথেন এবং হাইড্রোজেন-এর মিশ্রণকে পৃথিবীর প্রাথমিক অবস্থার অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টিতে তড়িৎ প্রবাহের অধীনে সংবাহিত করলেন। সূর্যের অতিবেগনী রশ্মির পরিবর্ত হিসেবে এ ব্যবহার করা হয়েছিল। পরীক্ষার ফল হল অবিশ্বাস্য। জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কতকগুলি বস্তু সংশ্লেষিত হল। এদের মধ্যে ছিল চারটি অ্যামাইনো অ্যাসিড। তা ছাড়া জীবদেহের বিভিন্ন ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় যে ইউরিয়া যৌগটির একটি মুখ্য ভূমিকা আছে, সেই যৌগটিও দেখা গেল।

মিলারের পরীক্ষার ফলে এ রকম একটা বিশ্বাস আরও গভীর হল যে, পৃথিবীর প্রাথমিক আবহমণ্ডলে অক্সিজেনবিহীন পরিবেশের মধ্যে সৌর উত্তাপে এবং অতিবেগনী রশ্মি অবলম্বনে জৈব জটিল অণুগুলি সৃষ্টি হয়েছিল।

তা হলে পৃথিবীর প্রথম প্রাণীরা এসেছিল অক্সিজেনবিহীন পরিবেশের মধ্যে, এমন ধারণা অসম্ভব নয়। এখনও পৃথিবীতে এমন কয়েকটি ব্যাকটেরিয়া আছে অক্সিজেনের পরিমণ্ডলে যাদের বাঁচা সম্ভব নয়। আমাদের কাছে অক্সিজেন যেমন অপরিহার্য তেমনি তাদের কাছে অক্সিজেন বিষের মত, মারাত্মক। এগুলিকে বলা হয় অবায়ুজীবী জীব (Anaerobic)।

কিন্তু একটি প্রশ্ন থেকে যায় : এই সব জৈব পদার্থ মুক্ত অবস্থায় বাঁচে না, তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তাহলে সৃষ্টির আদি পর্বে জীবন গড়ে তোলায় এদের ভূমিকা কি ছিল, এরা নিজেরা কি ভাবে অংশ-গ্রহণ করেছিল ?

পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টি হওয়ার আগে বায়ুমণ্ডলের চেহারাটা এ রকম ছিল না। এখন বায়ুমণ্ডলের চেহারাটা কি রকম ? পৃথিবীর বুক ছাড়িয়ে কিছুটা উপরে বায়ুমণ্ডলে ওজোন গ্যাসের একটি স্তর সমস্ত পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে। ফলে সূর্যের অতিবেগনী রশ্মির সামান্য অংশই পৃথিবীতে এসে পৌছোয়। কিন্তু পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডল গড়ে

ওঠার আগে সূর্যের অতিবেগনী রশ্মি সরাসরি এসে পৌঁছোত পৃথিবীর বুক পর্যন্ত। ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় জৈব মৌলিক পদার্থ গড়ে উঠেছিল এত বিপুল পরিমাণে যে, আদি সমুদ্র সব ওদের দ্বারা সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে। যে জীবাণু এইসব জৈব পদার্থের জীবন ধারণের ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তাদের তখন কোনো অস্তিত্ব ছিল না। ফলে তাদের বিনাশ প্রাপ্তিরও কোনো কারণ ঘটেনি। প্রাণের অস্তিত্বহীন, জীবনশূন্য সমুদ্রে এরা সঞ্চিত হতে শুরু করল। বিনাশ নেই, আহার্য হিসেবে গ্রহণ করার মত অন্য কোনো জীব ছিল না। মুক্ত অক্সিজেনও নেই আবহমণ্ডলে, যার জন্যে এগুলি জারণের সম্মুখীন হবে। আশঙ্কার অন্যতম কারণ ছিল অতিবেগনী রশ্মি এবং তেজস্ক্রিয় শক্তি, যারা এই জটিল অণুগুলিকে সৃষ্টি করেছিল। যদি এই যৌগগুলির কোনো বিভাজন হয়, তাহলে তা ওদের দ্বারাই সম্ভব।

কিন্তু আত্মরক্ষা জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম। সম্ভবত সমুদ্রস্রোতে এদের নিয়ে চলে গিয়েছিল অনেক গভীরে, তটভূমি থেকে নিরাপদ আশ্রয়ে। সেখানে সমুদ্র-পৃষ্ঠে অতি বেগনী আলোর বিকিরণ নেই এবং পৃথিবীর গভীরের তেজস্ক্রিয় বিকিরণ সরাসরি পৌঁছোয় না। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ ফিজিক্যাল সোসাইটির সামনে একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণাপত্র পেশ করেন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের জে ডি বারনাল। তিনি বলেন যে, জৈব যৌগগুলির সমুদ্র নিশ্চয়ই উপাদানের দিক দিয়ে ঘন ছিল না। ক্ষুদ্র অণুগুলিকে ঘন করে জীবন সৃষ্টির উপযোগী করে তোলার জন্যে কয়েকটি সরল এবং প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার নিশ্চয়ই প্রয়োজন।

বারনাল, হলডেন এবং ওপারিনের চিন্তার মধ্যে রাসায়নিক বিবর্তনের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা কয়েকটি প্রাথমিক ধারণার উপরে প্রতিষ্ঠিত।

প্রাণসৃষ্টির প্রথম যুগে পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রই যেন ছিল একটি বৃহদায়তন রসায়নাগার। এই সব রসায়নাগারেই নানা ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ভেতর দিয়েই সেই আশ্চর্য বিস্ময়টি সংঘটিত হল। বিভিন্ন

জটিল যৌগ থেকে পর্যায়ক্রমে প্রাণের সূচনার মুহূর্তটি এগিয়ে আসছিল। যুগান্তকাল ধরে প্রোটিন এবং নিউক্লিক অ্যাসিড সৃষ্টি হয়েছিল। এই যুগান্তকাল হয়তো বা দুশো কোটি বছর। তারপর এক সময়ে এই রাসায়নিক অভিব্যক্তির মাধ্যমে শুরু হল প্রাণের অভিব্যক্তি। চূড়ান্ত পর্যায়ে আকস্মিক কোনো মিলনে যেই সৃষ্টি হল নিউক্লিও-প্রোটিন অণু, প্রাণের শুরু হল সেই মুহূর্ত থেকে। এই যে নিউক্লিও-প্রোটিন জটিল অণু, এ অণু আপন অনুকৃতি সৃষ্টিতে সক্ষম, কারবন কপির মত নিজের হুবহু প্রতিমূর্তি গড়ে তোলার ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল। ফলে আদি সমুদ্রবক্ষে তাদের সৃষ্টি হল সীমাহীন সংখ্যায়।

যদি এই দ্বিত্বকরণের সময়ে পরিব্যক্তির প্রভাবে কোনো পরিবর্তিত অণুর সৃষ্টি হত, তাহলে? তাহলে যোগ্যতমের জয় (Survival of the fittest)-এই সত্যকে স্বীকার করে অধিকতর শ্রেষ্ঠ ক্রিয়াশীল অণুগুলি অন্যদের বিনাশ সাধন করে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করত। জৈব অভিব্যক্তি এইভাবে অগ্রসর হতে শুরু করল।

বর্তমানে জীবজগতে যত বৈচিত্র্যই লক্ষ্য করা যাক না কেন, সূচনা তার সম্ভবত একটিমাত্র আদি অণু থেকে।

আদি যুগের এই জীবিত অণুগুলি কোন্ প্রক্রিয়ায় শক্তি সঞ্চয় করত? যে কোনো রকম প্রাণের পক্ষে শক্তি অপরিহার্য। শক্তির প্রয়োজনে আদি যুগের এই জীবিত অণুগুলি জৈব পদার্থকে বিভাজিত করত। কিন্তু এইভাবে সমুদ্রবক্ষে জৈব অণুর ঘন সমাবেশ কখনই সম্ভব ছিল না। অতিবেগনী রশ্মি এবং তেজস্ক্রিয় বিকিরণের জন্যে আদি সমুদ্রবক্ষে জৈব অণুদের উৎপাদনের হার মন্থর ছিল। কিন্তু এক সময়ে এই প্রক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটল। শুরু হল এক নতুন অধ্যায়। সালোক-সংশ্লেষ (Photo-synthesis) পদ্ধতিতে এরা নিজেদের জৈব পদার্থের উৎপাদন শুরু করল এবং সে সূচনা হল বিপুল পরিমাণে। তখন আর পরনির্ভরতা রইল না। সমুদ্রের দ্রবণে খাদ্যের প্রাপ্তি বা খাদ্যের অনুসন্ধান নয়, খাদ্য এল জল এবং কারবন ডাই-অক্সাইড অবলম্বনে। প্রাণপদার্থ আপন প্রয়োজনীয় খাদ্য

সংশ্লেষিত করার মত এক অবস্থায় এসে পৌঁছোল।

জীবনের অভিব্যক্তির এই পর্যায়ে খাদ্য সংশ্লেষিত হতে আরম্ভ করল একটি আবরণীর মধ্যে। কোষের উৎপত্তি হল এইভাবে।

এই সব কোষ বায়ুমণ্ডলের কারবন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করল। বিমুক্ত হল অক্সিজেন। ধীরে ধীরে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল অক্সিজেনে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল অক্সিজেনে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠার পরে ঊর্ধ্বস্থ বায়ুস্তরে হল ওজনের আবির্ভাব। পৃথিবীর ঊর্ধ্বাকাশে এই ওজনের স্তর গড়ে ওঠার আগে পর্যন্ত সূর্যের অতিবেগনী রশ্মি সরাসরি পৌঁছে যেত ধরিত্রীর বুক পর্যন্ত। বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন জমা পড়ার পরে এবং ওজনের স্তর গঠিত হবার পরে অতিবেগনী রশ্মির দ্বার হল প্রায় রুদ্ধ। তার প্রবেশ হল নিষিদ্ধ প্রায়।

ইতিমধ্যে পৃথিবীর তেজস্ক্রিয়তাও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু জৈব পদার্থের সৃষ্টিতে তার আর কোনো ভূমিকা ছিল না। সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়া সেখানে এসেছে। তা ছাড়া বিভাজক বিকিরণ সব হ্রাস পেয়েছে। ফলে জটিল প্রাণবিকাশের অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি হল।

এই পর্যায়ে এক নতুন ধরনের কোষের উদ্ভব লক্ষ্য করা গেল। সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় এ খাদ্য উৎপাদনে সক্ষম ছিল না। ফলে উদ্ভিদ-কোষের উপরে তারা ছিল নির্ভরশীল। এই বিশ্বে প্রাণিজগতের সৃষ্টি হল এইভাবে।

সুশৃঙ্খল যে ধারায় এই বিশ্বে জীবন এবং বুদ্ধিমান জীবের আবির্ভাব সম্ভব, কেন সেইরকম কোনো ধারায় বহির্বিশ্বে, ব্রহ্মাণ্ডের অন্য কোথাও, অন্য কোনোখানে জীবন এবং বুদ্ধিমান জীব আজও দুর্লভ হয়ে থাকবে?

চতুর্থ অধ্যায়

বহির্বিশ্বে কি জীবনের অস্তিত্ব আছে? এ মানুষের চির কৌতূহলের বিষয়। ঊর্ধ্বমুখীন মানুষ বিশ্ব চরাচর পরিব্যাপ্ত করে যে গ্রহ উপগ্রহকে রাত্রির অন্ধকারে আবর্তনরত লক্ষ্য করে, সেই গ্রহ উপগ্রহ কি কোনো না কোনোভাবে প্রাণসঞ্চিত? মঙ্গল, বৃহস্পতি সম্পর্কেই আমাদের কৌতূহল বেশি। জীবনের অনুসন্ধানে গ্রহ-গ্রহান্তরের রহস্য উন্মোচিত হয়ে চলেছে স্তরে স্তরে। তাছাড়া আমাদের পরিচিত গ্রহজগৎ অতিক্রম করে বহির্বিশ্ব আছে। কে জানে, জীবনের অস্তিত্বের কোন্ রহস্য সেখানে উদ্ঘাটিত হবে!

পৃথিবী পৃষ্ঠে জীবন সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে বিবর্তনের যে ধারা অবলম্বন করে আজ এই উন্নত জীব মানবসন্তানের সৃষ্টি, সে ধারা যদি সৃষ্টির কোনো এক স্তরে একটি প্রতিকূল পরিবেশে এসে স্তব্ধ হয়ে যেত! তাহলে সৃষ্টির শৃঙ্খলে যে মানবজাতি আজ পৃথিবীতে বিরাজ করছে, তা নাও বিরাজ করতে পারত। মনুষ্য সৃষ্টি-শৃঙ্খল ছিন্ন হয়ে অন্য খাতে প্রবাহিত হত। তাহলে এই অনুকূল অবস্থাকে কি বলে অভিহিত করব? শুধুই আকস্মিকতাজনিত এই মানব সন্তান! না, তা নয়, একে বলা যায় Resonance—অনুকূল শৃঙ্খলের সংগঠিত মিলন। যদি কোনো সৃষ্টি প্রতিটি স্তরে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য-পূর্ণ হয় তাহলে সে অনুরণিত হয় এবং সৃষ্টির পরবর্তী স্তরে তার উন্নয়ন ঘটে। অন্যথা সৃষ্টি বন্ধ থাকে। তাহলে বহির্বিশ্বে—সে বহির্বিশ্ব আমাদের সৌরলোক বা তার বাইরে হোক—জীবন সৃষ্টির প্রশ্নটি ওই অনুরণন সাপেক্ষ। কিম্বা আমরা অন্য কোথা অন্য কোনো-খানে এমন অনুকূল পরিবেশের সন্ধান করি যেখানে জীবন সৃষ্টির উপযোগী অনুরণন সম্ভব। অন্য গ্রহে অনুসন্ধানের আগে, পৃথিবীর

সঙ্গে অন্যান্য গ্রহের একটা তুলনামূলক বিচার করে নেওয়া যাক।

জীবনের বিচিত্র বিকাশ নিয়ে মাতৃসমা পৃথিবীকে লক্ষ্য করি। সূর্যের থেকে দূরত্বের দিক দিয়ে তৃতীয় নিকটতম গ্রহ পৃথিবী, বুধ আর শুক্রের পরেই। সূর্য থেকে তার গড় দূরত্ব প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার বা প্রায় ৯ কোটি মাইল। অন্যান্য গ্রহের মত পৃথিবীও প্রায় বৃত্তাকার। সাধারণভাবে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ৬৩৭১ কিলোমিটার বা ৩৯৫৯ মাইল। পৃথিবী আপন অক্ষরেখাকে কেন্দ্র করে ১ দিনে অর্থাৎ ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট এবং প্রায় ৪ সেকেণ্ডে তারকামণ্ডলীর পটভূমিতে একটি আবর্তন সম্পূর্ণ করছে। পৃথিবীর সূর্যকে প্রদক্ষিণ কাল ৩৬৫'২৫ দিন। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মূল উপাদান অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন। সূর্য, পৃথিবী এবং চন্দ্রের মধ্যে ভরের অনুপাত ৩৩৩৪০০ : ১ : '০১২২৮। পৃথিবীর ঘনত্ব প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে ৫'৫ গ্রাম এবং এর পৃষ্ঠদেশে বায়ুর চাপ এক সেন্টিমিটার বর্গে ১ কিলো-গ্রাম। সূর্য পরিক্রমণে আবর্তনপথের উপরে পৃথিবীর বেগ সেকেণ্ডে ২৯'৮ কিলোমিটার অর্থাৎ ১৮'৫ মাইল। মাধ্যাকর্ষণকে অতিক্রম করে যেতে কোনো বস্তুর যে গতিবেগের প্রয়োজন তাকে বলা হয় প্রস্থান বেগ বা Escape velocity। পৃথিবীর ক্ষেত্রে এই বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১১'২ কিলোমিটার বা প্রায় ৭ মাইলের সমান। পৃথিবীর বুকে যে মানবসভ্যতা গড়ে উঠেছে তা এই পরিবেশকেই অবলম্বন ক'রে।

জীবন ধারণের অনুকূল পৃথিবীর এই তথ্য এবং পরিবেশের সঙ্গে চন্দ্র, বুধ এবং অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের পরিবেশ এবং তথ্যের পার্থক্য একবার লক্ষ্য করা যাক। চন্দ্রের গড় ব্যাস ৩৪৮০ কিলোমিটার, আবহাওয়ামণ্ডলের উপাদান কিছু নেই। দিবাকালে প্রচণ্ড উত্তাপ, রাত্রিকালে প্রচণ্ড শৈত্য।

চন্দ্রে কি জীবনের অস্তিত্ব আছে? চন্দ্র অভিযানের পূর্ব পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের মনে এ রকম একটা সম্ভাবনার বীজ উঁকি দিয়েছিল যে, আবহাওয়ামণ্ডল ছাড়াই চন্দ্রে হয়তো কোনো না কোনো ধরনের

জীবনের অস্তিত্ব থাকতে পারে। চন্দ্র অভিযাত্রীরা যখন ফিরে এলেন এই আশঙ্কায় তাঁরা কিছুদিন বন্দী জীবনও যাপন করলেন। কিন্তু চান্দ্রশিলার বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, সেখানে কোনো ধরনের জীবনের অস্তিত্ব নেই। অবশ্য চান্দ্রমৃত্তিকায় জৈব যৌগের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে, জলের সান্নিধ্যে এ অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি করতে পারে।

চন্দ্রের পরে বুধে আসা যাক। সূর্যের নিকটতম গ্রহ বুধ অর্থাৎ সূর্যের আলোকোচ্ছ্বাসের মধ্যেই এটি সূর্যকে পরিভ্রমণ করে। সূর্য থেকে এটির গড় দূরত্ব প্রায় ৬ কোটি কিলোমিটার অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ৩ কোটি মাইল, তুলনায় পৃথিবী থেকে দূরত্ব ১৫ কোটি কিলোমিটার অর্থাৎ এটি সর্বদা সূর্যের কাছাকাছিই অবস্থিত। গ্রহটির ব্যাস ৪৮০০ কিলোমিটারের মত অর্থাৎ প্রায় ৩০৫০ মাইল। সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে গ্রহটির সময় লাগে ৮৭·৯৬৯ দিন। বুধের ভর কত? পৃথিবীর ভর ১ হলে এটির ভর ·০৫৪ জলের ঘনত্ব ১ ধরে এটির ঘনত্ব প্রতি সেন্টিমিটার ঘনবর্গে ৫ ২ গ্রাম? এই ঘনত্ব পৃথিবীর ঘনত্বের খুব কাছাকাছি। সূর্য পরিভ্রমণে আবর্তনপথের উপরে এর গতিবেগ সাধারণভাবে সেকেণ্ডে ৪৮ কিলোমিটার অর্থাৎ প্রায় ৩০ মাইল। বুধের আবহমণ্ডলে হিলিয়ামের অস্তিত্ব জানা গেছে কিন্তু পৃথিবীর আবহমণ্ডলের সে এক অতি সামান্য ভগ্নাংশ।

বুধগ্রহে জীবনের সম্ভাবনা কতটা? চন্দ্রের সঙ্গে বুধগ্রহের মূলগত মিল আছে। বুধ পৃষ্ঠ ক্রেটার বা গহ্বরযুক্ত এবং প্রায় আবহমণ্ডল বর্জিত। জল বা বাতাস সেখানে থাকার সম্ভাবনা কম এবং সেই সঙ্গে জীবনের সম্ভাবনাও।

এবার শুক্রগ্রহের কথা।

বুধের তুলনায় শুক্রগ্রহের আর একটু বৈশিষ্ট্য আছে।

শুক্রগ্রহ সূর্যের থেকে দূরত্বের দিক দিয়ে দ্বিতীয় গ্রহ। পৃথিবীর রাতের আকাশে চন্দ্রের পরেই এটি দ্বিতীয় উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। শুক্রগ্রহ সূর্যকে আবর্তন করে প্রায় একটি বৃত্তাকার কক্ষপথে। এই

গ্রহটি যখন সূর্য এবং পৃথিবীর মধ্যে অবস্থান করে, তখন সে পৃথিবীর সর্বাধিক নিকটে আসে। সূর্য থেকে এটির গড় দূরত্ব প্রায় ১১ কোটি কিলোমিটার বা প্রায় সাড়ে ৬ কোটি মাইল। আবহমণ্ডল না ধরে শুক্রের ব্যাস প্রায় ১২১০০ কিলোমিটার বা ৭৫০০ মাইল। সূর্যকে কেন্দ্র করে এর একটি আবর্তনকালের সময় ২২৫ দিন। শুক্রগ্রহের ভর কত? পৃথিবীর ভর যদি ১ হয় তাহলে শুক্রের ভর '৮১। শুক্র-গ্রহের ঘনত্ব পৃথিবীর ঘনত্বের মতনই। পৃথিবীর ঘনত্ব প্রতি ঘন সেন্টি-মিটারে যেখানে ৫'৫ গ্রাম, শুক্রের ঘনত্ব সেখানে ৫'১ গ্রাম। সূর্য পরিক্রমণ পথে এর গতিবেগ সাধারণভাবে সেকেণ্ডে ৩৫ কিলোমিটার অর্থাৎ প্রায় ২২ মাইল। শুক্রগ্রহের আবহমণ্ডল কি রকম? শুক্র-গ্রহের আবহমণ্ডলের উপাদান প্রধানত কারবন ডাই-অক্সাইড, তা ছাড়া অল্প পরিমাণে জলীয় বাষ্প, কারবন মনো-অক্সাইড প্রভৃতিও সেখানে পাওয়া যায়। শুক্রের আকাশে এবং মাটিতে আজ পর্যন্ত সোভিয়েট রাশিয়ার এবং আমেরিকার কয়েকটি মহাকাশ অভিযান হয়েছে। শুক্রকে নিয়ে অনেক রহস্য এই সব অভিযান থেকে ক্রমে ক্রমে উন্মোচিত হচ্ছে।

এই সব অভিযান থেকে দেখা যায় যে, যদি শুক্রের আবহমণ্ডলের সমস্ত কারবন ডাই-অক্সাইড পৃথিবীতে অবমুক্ত হত, তাহলে পৃথিবী প্রায় শুক্রেরই অনুরূপ হয়ে উঠত। শুক্রগ্রহে আবহচাপ কত? পার্থিব আবহচাপের তুলনায় এখানে আবহচাপ ১০০ গুণ বেশি। এটির পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা ৪৮০ ডিগরি সেনটিগ্রেড। এই উত্তাপে সীসা গলে এবং পারদ গ্যাসে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু শুক্রগ্রহের আবহ-মণ্ডলের উপরি ভাগের উত্তাপ যথেষ্ট কম, '৫৩ ডিগরি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত হতে পারে। এই অংশে জীবন সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ থাকা সম্ভব।

শুক্রগ্রহে কি উদ্ভিদ্ আছে বা জীবনের প্রাথমিক লক্ষণ?

যদি কোনো গ্রহে উদ্ভিদের সন্নিবেশ ঘটত, তা হলে তা আবহ-মণ্ডলে মুক্ত অক্সিজেন নিয়ে আসত। উদ্ভিদ্ বাতাসের কারবন ডাই-অক্সাইড বিয়োজন করে নিজের পুষ্টির জন্যে কারবন গ্রহণ করত, মুক্ত

হত অক্সিজেন। মনে হয় শুক্র গ্রহের আকাশে ঘন মেঘের আচ্ছাদন উদ্ভিদ্ সৃষ্টির জন্যে প্রয়োজনীয় যথেষ্ট পরিমাণ সৌর বিকিরণ শুক্র পৃষ্ঠে নিয়ে আসতে দেয় না। অবশ্য শুক্র পৃষ্ঠে যে উদ্ভিদ্ নেই বা জীবনের প্রাথমিক লক্ষণ সেখানে অনুপস্থিত, এ কথা আজও প্রমাণিত হয়নি। আর জীবনের প্রাথমিক লক্ষণ আছে, এমন কথা বলার অবস্থা আজ এখনও সৃষ্টি হয়নি।

এবার মঙ্গল এবং বৃহস্পতির কথা বলতে হবে। জীবনের অনুসন্ধানে মঙ্গল এবং বৃহস্পতির নাম একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়।

নবগ্রহের মধ্যে লোহিত বর্ণের গ্রহ মঙ্গল দূরত্বের দিক দিয়ে সূর্যের থেকে চতুর্থ। সূর্য থেকে এর গড় দূরত্ব প্রায় ২৩ কোটি কিলোমিটার বা প্রায় ১৪ কোটি মাইল। সাধারণভাবে মঙ্গল গ্রহের ব্যাস বলা যায় ৬৭৫০ কিলোমিটার বা ৪২০০ মাইল। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে আসতে গ্রহটির সময় লাগে ৬৮৭ দিন। মঙ্গলের ভর কত? পৃথিবীর ভর ১ হলে মঙ্গলের ভর পৃথিবীর ভরের প্রায় ১/১০ ভাগ। মঙ্গলের সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন দিক দিয়ে তুলনা করলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপ যদি ১ হয়, তাহলে মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের চাপ তার শত ভাগের ১ ভাগ মাত্র। পৃথিবীকে যতটা সৌর বিকিরণ গ্রহণ করতে হয়, মঙ্গল গ্রহ তার তুলনায় কতটা সৌর বিকিরণ গ্রহণ করে? পৃথিবীর তুলনায় তা অর্ধেকেরও কম। তা ছাড়া তার আবহমণ্ডল অত্যন্ত হাল্কা, হয়তো বা পৃথিবীর শতভাগের এক ভাগ। ফলে গ্রহটির তাপমাত্রা অত্যন্ত অল্প। সমগ্র গ্রহমণ্ডলটিতে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা -৫০ ডিগরি সেন্টিগ্রেডের মত। মঙ্গলগ্রহের লঘু তাপমাত্রা এবং কারবন ডাই-অক্সাইডের আবহমণ্ডল সত্ত্বেও একটা কথা সত্য যে, এখানকার অবস্থা কুমেরু অঞ্চলের তুষারাবৃত হ্রদের মত—সেখানে জীবাশ্মের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। নীল-সবুজ শ্যাওলা প্রভৃতি কয়েক ধরণের অবয়বী আছে, অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশে এরা জীবন ধারণ করতে পারে। পরীক্ষাগারে দেখা গেছে মঙ্গলের অনুরূপ আবহমণ্ডলে এরা বেঁচে থাকে।

এই পরিবেশে কি মঙ্গলগ্রহে জীবনের অস্তিত্ব সম্ভব? সৌর-লোকের যে গ্রহটিতে জীবনের সম্ভাবনার কথা বিশেষভাবে বলা হয়, তা হল মঙ্গল। কল্পবিজ্ঞানে এর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। সেখানে মঙ্গললোকবাসীদের কথা বলা হয়েছে।

নিঃসন্দেহে এই গ্রহটি সম্পর্কে আমাদের কৌতুহলের সীমা নেই। জীবনের অনুসন্ধানে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই গ্রহটিকে লক্ষ্য করে আসছেন অসীম আগ্রহ নিয়ে। প্রায় একশো বছর আগে ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে ইটালি দেশীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী Schiaparelli (১৮৩৫-১৯১০) মঙ্গলের পৃষ্ঠপটের এক চিত্রে কয়েকটি রেখা অঙ্কন করেন। তিনি যে সর্বপ্রথম মঙ্গলের পৃষ্ঠদেশে এই রেখাগুলি লক্ষ্য করেন তা নয়, কিন্তু তাঁর কৃতিত্ব এই যে, উন্নত টেলিস্কোপের সাহায্যে এগুলি তাঁর দৃষ্টিতে অনেক বিস্তারিতভাবে ধরা পড়ে। ইটালি দেশীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী এগুলিকে CANALI নামে অভিহিত করেন। তাঁর ভাষায় কানালির অর্থ প্রণালী বা Channel কিন্তু অর্থ বিপর্যয়ে তা Canal বা খাল হিসেবে গৃহীত হয়ে এসেছে। এক সময়ে অনেকেই মনে করতেন, এই খাল নিশ্চয় বুদ্ধিমান জীবের সৃষ্টি।

বহির্বিশ্বে বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব নেশা জাগায় এবং সে নেশা সংক্রামক। মহাকাশের যে কোনো গবেষণায় প্রথম জিজ্ঞাসা, জীবনের অস্তিত্ব; কালের ব্যবধানেও যে প্রশ্ন অনুরণিত হয়। যুক্তি বলে, এই বিশাল শূন্যে আমরাই কেবলমাত্র জীবিত প্রাণী, এ অসম্ভব।

সাম্প্রতিক কালে মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে। ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকার কৃত্রিম মহাকাশযান মেরিনার ফোর মঙ্গলগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছিল। ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দে মঙ্গলের নিকটতর হল মেরিনার সিক্স এবং সেভেন। এরপর মেরিনার নাইনের পরিকল্পনা। মঙ্গলের আকাশে সে এসে পৌঁছোল নভেম্বর ১৯৭১। ওই বছরই সোভিয়েট রাশিয়া থেকে দুটি মহাকাশযান উৎক্ষিপ্ত হয়।

অবশেষে ভাইকিং প্রকল্প। ১৯৭৬ জুলাই মাস। মঙ্গলে কি জীবন আছে, বা কোনোদিন ছিল, সে জীবন যে কোনো পর্যায়েরই হোক?

যে কোনো মহাকাশ প্রকল্পেরই কয়েকটি লক্ষ্য থাকে—সে প্রকল্প মানবযুক্ত কোনো অভিযান হোক বা নাই হোক : হতে পারে, তা বৈজ্ঞানিক, ব্যবহারিক বা ব্যবসায়িক এবং আত্মিক বা ধর্মসংক্রান্ত। সব সময়ে যে এগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব, তা নয়। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এগুলিকে স্বতন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করা দুঃসাধ্য।

সে যাই হোক, একথা ঠিক যে এ সবের মধ্যে বিজ্ঞানের স্থান শীর্ষে। দারিদ্র্যে এবং কুশিক্ষায় যদি আমাদের আত্মিক বিনাশ না ঘটে থাকে তা হলে বহির্জগৎ সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক এবং এদিক দিয়ে মঙ্গল বোধহয় সকল কৌতূহলের কেন্দ্রমণি।

১৯১৯ সালে যে মেরিনার নাইন মহাকাশযান মঙ্গলগ্রহকে পরিক্রমণ করে, তা গ্রহটির বিস্তারিত আলোকচিত্র গ্রহণ করেছিল। এই সব আলোকচিত্র অবলম্বনে জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে কি সুস্পষ্ট-ভাবে কোনো সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব? না, কখনো নয়। অবশ্য এ কথা সত্য যে, এ জাতীয় আলোকচিত্র কল্পনার অনেক অবসান ঘটায়, তবুও খুব কাছ থেকে নেওয়া আলোকচিত্র অবলম্বনে কোনো গ্রহে জীবনের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো রকম স্পষ্ট ধারণা সম্ভব নয়।

সকল সংশয়ের অবসানে অবশেষে ভাইকিং এসে অবতরণ করল মঙ্গলের পৃষ্ঠদেশে। শুধু জৈবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাই ভাইকিংয়ের লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু জীবনের অস্তিত্বের প্রশ্নটি সাধারণের কাছে আর সমস্ত জিজ্ঞাসার চেয়ে বড় হয়ে উঠল।

অনুমান নির্ভর নয়, শতাব্দীকালের সকল ধারণার অবসান ঘটিয়ে বহির্বিশ্বে জীবনের অস্তিত্ব সংক্রান্ত প্রশ্নটির বৈজ্ঞানিক সমাধানের উজ্জ্বল সম্ভাবনা নিয়ে এল এই ভাইকিং প্রকল্প।

মঙ্গলগ্রহে কি জীবন আছে? না, সেখানকার পরিবেশ জীবন সৃষ্টির পক্ষে এমনই প্রতিকূল যে, বর্তমানে সেখানে জীবনের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

বিজ্ঞানীরা আশা করেছিলেন যে, ভাইকিং প্রকল্প যদি মঙ্গলে জীবনের অস্তিত্বের সন্ধান পায়, তাহলে তা যে শুধু মঙ্গলগ্রহে জীবনের সম্ভাবনার প্রশ্নটির সমাধান করবে তা নয়, এই ব্রহ্মাণ্ডে জীবনের রূপ কি, রসায়ন কি—এই সব প্রশ্নেরও সে একটি সুস্পষ্ট উত্তর দেবে। মর্ত্যলোকে জীবনের আকারের বৈচিত্র্য অসংখ্য, সীমাহীন। কিন্তু আকারের এই বৈচিত্র্য সত্ত্বেও একদিক দিয়ে জীবনের একটি সুস্পষ্ট ধর্ম আছে। মানুষ হই, কীটানুকীট হই, উদ্ভিদ্ হই, সরীসৃপ হই—পার্থক্যের এই চেহারাটি একেবারে বাহ্যিক। মূলে আমরা সামান্য কয়েকটি জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার হেরফের মাত্র। যদি মঙ্গলগ্রহে জীবন জৈব রাসায়নিক ভাবনায় পার্থিব জীবনের অনুরূপ হয়? তখন হয়তো মনে হবে, ব্রহ্মাণ্ডের যে কোনো নক্ষত্র-লোকে, গ্রহজগতের যে কোনো গ্রহ-উপগ্রহে জীবন সৃষ্টির মূল এক এবং অভিন্ন।

কিন্তু জীবনের অস্তিত্বের সন্ধানে ভাইকিং কী রহস্য উদ্‌ঘাটিত করল?

না, জীবনের পক্ষে অপরিহার্য সেখানে কোনো জটিল জৈব যৌগের সন্ধান পাওয়া গেল না।

অবশ্য একথা ঠিক যে, জৈব যৌগের উপস্থিতিই জীবন নয়, কিন্তু জৈব যৌগ ছাড়া জীবন সম্পর্কে ধারণা করা কঠিন।

এইবারে বৃহস্পতির কথা। সৌরজগতে বৃহস্পতি সর্ববৃহৎ গ্রহ—সে হল গ্রহকুলের দানব। ভারতীয় জ্যোতিষে তাকে বলা হয় দেবগুরু। সূর্যের থেকে দূরত্বের দিক দিয়ে এটি পঞ্চম গ্রহ। সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব যদি ১ ধরা হয়, তাহলে বৃহস্পতির দূরত্ব তার ৫ গুণেরও বেশি। নিরক্ষীয় অঞ্চলে গ্রহটির ব্যাস ১৪২৮০০ কিলো-মিটার অর্থাৎ ৮৮৭৩০ মাইল এবং মেরু অঞ্চলের ব্যাসের থেকে তা প্রায় ৮৮০০ কিলোমিটার বা ৫৫০০ মাইলের মত বেশি। অর্থাৎ এর ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় ১১ গুণ। সহজ কথা নয়। আকৃতির হিসেব নিলে দেখা যায় যে, বৃহস্পতির আয়তনের মধ্যে ১৩০০

পৃথিবীর জায়গা হয়ে যেতে পারে। আপন অক্ষের উপরে গ্রহটির একবার আবর্তনে সময় লাগে প্রায় ৯ ঘন্টা ৫৫ মিনিট। এই ঘূর্ণন অন্যান্য আর সব গ্রহের ঘূর্ণনের চেয়ে দ্রুত এবং পৃথিবীর ঘূর্ণনের তুলনায় এ দ্বিগুণের বেশি জোরে ঘুরে চলেছে। বৃহস্পতির বর্ষমান ১১.৮৬ পার্থিব বর্ষ। গ্রহটির ভর পৃথিবী থেকে প্রায় ৩১৮ গুণ বেশি। সৌরজগতে আর যত সব গ্রহ-উপগ্রহ আছে তাদের সকলের মিলিত ভরের চেয়েও বৃহস্পতির একার ভর দ্বিগুণের ওপর। এটির ঘনত্ব কত? জলের ঘনত্ব ১ ধরে বৃহস্পতির ঘনত্ব ১.৩৩৪। এবং সে ঘনত্ব আমাদের পৃথিবীর ঘনত্বের প্রায় সিকি ভাগের মতন। বৃহস্পতির মহাকর্ষীয় টান পৃথিবীর তুলনায় প্রায় ৫ গুণ বেশি। পৃথিবী সূর্য থেকে যতটা উত্তাপ গ্রহণ করে বৃহস্পতি নেয় তার প্রায় ১/২৫ ভাগ। কক্ষপথের উপরে গ্রহটির গতি সেকেণ্ডে ১৩ কিলোমিটার বা ৮ মাইলের মতন। বৃহস্পতির তেরোটি উপগ্রহ।

বিভিন্ন গ্রহের মধ্যে আবহমণ্ডলের দিক দিয়ে বৃহস্পতির অনন্য-সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। এর মেঘরাজ্যের ওপরকার তাপমাত্রা -২৩০ ডিগরি ফারেনহাইট। অন্তর্দেশে সে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। বৃহস্পতির মূল উপাদান হাইড্রোজেন। গ্রহটি ঘূর্ণায়মান গ্যাসীয় পুঞ্জ এবং তরলের একটি বিরাট গোলক। বৃহস্পতির স্বল্প ঘনত্ব এবং তার ভরের আধিক্য দেখে সে কথা অনুমান করা অসঙ্গত নয়। বৃহস্পতির আবহমণ্ডল ঘন; এত ঘন যে সেখানে কোনো জীবন থাকলে তা থাকবে ভাসমান অবস্থায়—ভাসমান চিড়িয়াখানার প্রাণী হিসেবে। এই আবহমণ্ডল পৃথিবীর তুলনায় কি রকম? আজ থেকে কয়েক শো কোটি বছর আগে পৃথিবীর আবহমণ্ডল যে রকম ছিল, বিজ্ঞানীরা মনে করেন, বৃহস্পতির এখনকার আবহমণ্ডল সে রকম। তাহলে বৃহস্পতির বর্তমান পরিবেশ জীবনের সৃষ্টি, বিকাশ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে একটি স্বাভাবিক গবেষণাগার। গবেষণাগারেও বৃহস্পতির অনুরূপ আবহমণ্ডল নিয়ে অতিবেগনী রশ্মি ও আহিত কণার বিস্ফোরণের সাহায্যে জৈব যৌগ যে সম্ভব তা দেখানো হয়েছে। কিন্তু জৈব যৌগ এবং

জীবকোষ সৃষ্টির মধ্যে দুস্তর ব্যবধান আছে এবং গবেষণাগারে অতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া এখনও সম্ভব হয়নি। কিন্তু এ কথা প্রায় সুনিশ্চিত যে, পৃথিবীতে জীবনের সৃষ্টি হয়েছিল এই রকম এক পরিমণ্ডলের ভেতর থেকেই। সাম্প্রতিক কালে মহাকাশযান থেকে যে সংবাদ সংগৃহীত হয়েছে তাতে এই বিপুলায়তন গ্রহটিতে জীবনের সম্ভাবনার অনুকূল পরিবেশ পরীক্ষার বিষয়টি অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে। এই গ্রহের আবহমণ্ডলের প্রধান উপাদান অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন এবং মিথেন। তাছাড়া সম্ভবত আছে জল। কেউ কেউ মনে করেন যে, বৃহস্পতিতে যে প্রকার রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্ভব, তাতে সরল জীবের উদ্ভব ঘটতে পারে, কিন্তু বিষয়টি যতই চমক সৃষ্টি করুক, এ একেবারেই অনুমাননির্ভর।

বৃহস্পতি গ্রহটির বহু অজ্ঞাত রহস্য উদ্ধারের জন্যে আমেরিকান মহাকাশবিজ্ঞানীরা গ্রহটির সান্নিধ্যে দুটি মহাকাশযান প্রেরণ করেন গ্যালিলিও দূরবীনে প্রথম এই গ্রহটিকে লক্ষ্য করেছিলেন। গ্রহটির সম্পর্কে তখনকার ধারণা ছিল অনুমাননির্ভর। তারপর বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সাম্প্রতিক কালে গ্রহসান্নিধ্যে দুটি মহাকাশযান প্রেরণ করা হয়—প্রথমটি পায়োনীয়ার টেন; তার বৎসর কালের মধ্যে গেল পায়োনীয়ার ইলেভেন। পায়োনীয়ার টেন ১৯১৯ সালে ডিসেম্বরের ৩ তারিখে বৃহস্পতির ৮১০০০ মাইল সান্নিধ্যে এসেছিল। পায়োনীয়ার ইলেভেনে সে দূরত্ব কমে এল ২৬০০০ মাইলে।

পায়োনীয়ার অভিযান বৃহস্পতি গ্রহে জীবন সম্পর্কে কি বার্তা বহন করে নিয়ে এল? গ্রহটির নিকটতর অবস্থান থেকে পায়োনীয়ার ইলেভেন বৃহস্পতির যে চিত্র প্রেরণ করে, তার সবগুলিতেই কমলা রংয়ের ছোপ দেখা যায়। বিজ্ঞানীরা এই চিত্রগুলি থেকে এই রকম একটা ধারণা করছেন, সৌরজগতের সর্ববৃহৎ এই গ্রহটিতে জীবনের সম্ভাবনা আছে।

মনুষ্য পরিকল্পিত এবং নির্মিত পায়োনীয়ার মহাকাশযান দুটি আজ পর্যন্ত সকল মহাকাশযানের মধ্যে দ্রুততম গতিযুক্ত। তারা শুধু

বৃহস্পতির উদ্দেশ্যেই প্রেরিত হয়নি। তারা শনির অভিকর্ষ পার হয়ে আমাদের সৌরজগৎকেও অতিক্রম করে চলে যাবে।

চলার পথে যদি কোনো অজানা সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়—আমাদের নক্ষত্রলোকে বা আমাদের নক্ষত্রলোক অতিক্রম করে অন্য আর কোথাও? এই সম্ভাবনার কথা মনে রেখে মহাকাশবিজ্ঞানীরা পায়োনীয়ার টেন এবং ইলেভেন মহাকাশযান দুটিকে অনুরূপ খোদাই করা দুটি ফলক সংযোজিত করেছেন। প্রতিটি ফলক দৈর্ঘ্যে ৯ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ৬ ইঞ্চি। এতে আমাদের পৃথিবীর অবস্থান, মহাকাশযানের নির্মাণকাল, উৎক্ষেপনের সময় এবং মানব সভ্যতার আকৃতি প্রকৃতির সামান্য পরিচয় দেওয়া আছে। যদি কোনো বহিঃস্থ সভ্যতা আমাদের পরিচয় পাওয়ার পরে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগে আগ্রহী হয় তাহলে পায়োনীয়ারে সংযোজিত ফলক থেকে তারা আমাদের ঠিকানা পাবে। এক কথায় পৃথিবীতে পরিভ্রমণে আসার এটি একটি নিমন্ত্রণ পত্র।

নিমন্ত্রণ পত্রটির পরিকল্পনা করেন বহির্জাগতিক জীবন নিয়ে গবেষণারত দুই বিশিষ্ট বিজ্ঞানী কার্‌ল সাগান এবং ফ্রান্‌ক ড্রেক। এটি অঙ্কন করেন সাগানের শিল্পী পত্নী। চিত্রটিতে আছে বর্তমান কালের একটি সাধারণ পুরুষ ও নারীর প্রতিকৃতি অর্থাৎ গড় আকৃতির মানবমূর্তি—যে মূর্তি দেশ, কাল, ধর্ম-নিরপেক্ষ। এই প্রতিকৃতিতে আমাদের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যাবে। স্বাগত জানানোর ভঙ্গীতে পুরুষের ডান হাতটি সামান্য উত্থিত। মানবমূর্তির পশ্চাতে আছে পায়োনীয়ারের একটি রেখা চিত্র। এই যে পায়োনীয়ার মহাকাশযান এবং মানবমূর্তি—এদের দৈর্ঘ্য কিন্তু অসমঞ্জস নয় : এরা আনুপাতিক, ফলে কোনো দ্রষ্টা পায়োনীয়ারের দৈর্ঘ্য থেকে মানব-আকৃতির একটা সুস্পষ্ট হিসেব পাবে। চিত্রের নীচের দিকে দেখা যায়, দশটি বৃত্ত। বৃহত্তম বৃত্তটি সূর্য, অন্য নটি বৃত্ত নটি গ্রহকে নির্দেশ করছে। সূর্যের পর তৃতীয় যে গ্রহ, সেটি হল পৃথিবী। এই পৃথিবী থেকে তীর চিহ্নিত একটি রেখা চলে গিয়েছে পঞ্চম এবং ষষ্ঠ গ্রহের ভেতর দিয়ে :

পঞ্চম গ্রহ বৃহস্পতি এবং ষষ্ঠ শনি। তীরচিহ্নিত বাঁকা পথটি হল পায়োনীয়ারের পথ। তীরের অগ্রে তার একটি নকশাও নজরে আসে।

এই সব কিছুরই পরিকল্পনা শুধু একটি সম্ভাবনার কথা মনে রেখে: যদি পায়োনীয়ার মহাকাশ যান অন্য কোনো লোকে, অন্য কোনো সভ্যতার হস্তগত হয়! কিন্তু যদি বা তা হস্তগত হয় তাহলেও এই অসীম মহাশূন্যে তারা এই সৌরজগতের সন্ধান পাবে কি করে?

চিত্রে সৌরপরিবারের উপরে ১৪টি সরলরেখা একটি কেন্দ্রবিন্দুতে এসে মিলিত হয়েছে। এই সরলরেখাগুলিকে একেবারে সম্পূর্ণ সরল বলা যায় না। এরা আনুভূমিক এবং উলম্ব ড্যাসযুক্ত। যে ১৪টি সরলরেখা চিত্রে নজরে আসে এরা প্রত্যেকেই এক একটি পালসার।

পালসার কাকে বলে? পালসার আধুনিক জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানের এক আবিষ্কার। ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম এর সন্ধান পাওয়া যায়।

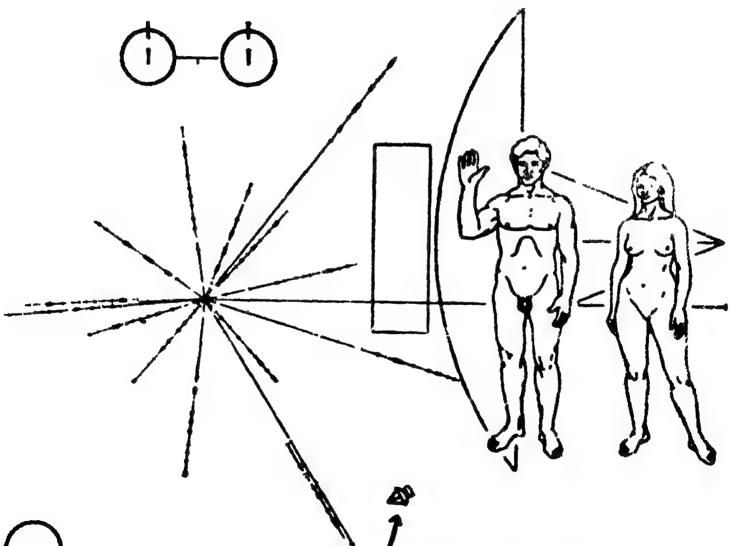

পায়োনীয়ার মহাকাশযান বহির্জাগতিক সভ্যতার উদ্দেশ্যে যে নিমন্ত্রণ পত্রটি নিয়ে মহাশূন্যে যাত্রা করেছে, সেটির নকশা।

পালসার কথাটি এসেছে পাল্‌স থেকে। পাল্‌স কথার অর্থ স্পন্দন। পালসার হল বেতার উৎস। এরা বেতার রশ্মি বিকিরণ করে। পালসারের এই বেতার রশ্মির বিকিরণ সময়ানুগ। সেকেণ্ডের এক অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ সময় অর্থাৎ প্রায় কয়েক শতভাগের এক ভাগ এই বিকিরণ স্থায়ী। তারপর বিরতি। আবার প্রেরণ এবং পুনর্বার বিরতি। বিরতিকাল মোটামুটিভাবে ১ সেকেণ্ডের কম। বিভিন্ন পালসারের বিরতিকাল ভিন্ন। কিন্তু এক একটি পালসারের বিরতিকাল আশ্চর্যজনকভাবে নির্দিষ্ট। পালসারের বৈশিষ্ট্যও এই যে, এদের বিকিরণের তারতম্য ঘটলেও, বিরতিকালের কখনও পরিবর্তন ঘটে না। চিত্রে ১৪টি পালসার অবলম্বনে সূর্যকে নির্দেশ করা হয়েছে। প্রতিটি পালসার তার পর্যায়কাল যুক্ত যাতে সেগুলিকে সুচিহ্নিত করা যায়। আসলে পালসার হল মহাজাগতিক ঘড়ি, প্রায় নিখুঁতভাবে এই ঘড়ির সাহায্যে সময় পরিমাপ করা চলে। কী ভাবে ?

পালসারের বেতার তরঙ্গ (Radio Frequency) একটা নির্দিষ্ট হারে হ্রাস পায়। সুতরাং যে কোনো পালসারে স্পন্দন পর্যায়ের পরিবর্তন থেকে কালের পরিমাপ নির্ণয় করা কঠিন নয়, সে সময় পর্ব যতই দীর্ঘ হোক না কেন। এই স্পন্দন পর্যায়ের হ্রাস অর্থ বিরতিকালের বৃদ্ধি। একটি সাধারণ পালসারের ক্ষেত্রে বিরতিকাল বর্ধিত হয়ে দ্বিগুণ হতে সময় লাগে প্রায় ১ কোটি বছর। ফলে উৎক্ষেপন-কালের পালসারের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ থেকে প্রযুক্তি বিজ্ঞানের দিক থেকে উন্নত যে কোনো সভ্যতাই পায়োনীয়ার মহাকাশযান এই ঐতিহাসিক যাত্রায় কত কাল অতিক্রম করেছে স্থির করতে পারবে ; যদি কেবল ওই পালসারটির তৎকালীন বিরতিপর্ব জানা যায়।

বিভিন্ন তথ্যের নির্দেশে ফলকটিতে সময় এবং দৈর্ঘ্য কিভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ? মর্ত্যের সময় এবং দৈর্ঘ্যের সকল পরিমাপ অন্য লোকে অচল। বর্ষ, মাস, দিন, ঘণ্টা, মিনিট, সেকেণ্ড অনন্ত শূন্যে অর্থহীন ; মাইল, গজ, ফুট, ইঞ্চি বা মিটার, কিলোমিটার তাৎপর্যশূন্য।

পায়োনীয়ারযুক্ত ফলকে সময় এবং দৈর্ঘ্যের এক একক উল্লেখ

করা হয়েছে ১৪টি পালসারের উপরে একটি ডামবেল আকৃতির চিত্রের মধ্যে। মহাবিশ্বে সুলভতম হল হাইড্রোজেন পরমাণু। এই হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রতে আছে একটি প্রোটন। প্রোটন হল ধনাত্মক বস্তুকণা। ঋনাত্মক বস্তুকণা কোন্‌টি? তা হল ইলেকট্রন। একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর মধ্যে একটি ইলেকট্রন প্রায় একটি বৃত্তাকার কক্ষপথে কেন্দ্রস্থ প্রোটনের চারপাশে আবর্তন করে চলেছে। এই আবর্তন, পৃথিবী যেমন সূর্যকে আবর্তন করে চলেছে, সেরকম। অর্থাৎ সে যেমন প্রোটনকে অবর্তনরত, তেমনি সে নিজের অক্ষের চারপাশেও ঘুরে চলেছে। প্রোটনের চতুর্দিকে ইলেট্রনের ঘূর্ণনের সময়ে ওর নিজের অক্ষের উপরে যে গতি, স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার দিক পরিবর্তন হয়। তখনই বেতার-তরঙ্গের বিকিরণ ঘটে। এই বেতার-তরঙ্গ অনন্যসাধারণ। এর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ২১ সেন্টিমিটার এবং কম্পন-সংখ্যা প্রতি সেকেণ্ডে ১৪২০ মেগাহার্জ বা প্রতি সেকেণ্ডে ১৪২০০০০০০০ বার। ২১ সেন্টিমিটার দীর্ঘ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য—এই হল দৈর্ঘ্যের একক। এই দৈর্ঘ্যের একক অবলম্বনে মানব আকৃতি কতটা দীর্ঘ তা গণনা করা যায়।

চিত্রটির একেবারে ডান প্রান্তে নারী মূর্তিটি কতটা দীর্ঘ তার একটা হিসেব দেওয়া আছে। নারীমূর্তির মাথার চুল থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত নির্দেশ করছে যে দুটি ড্যাস (— —) তার মধ্যে একটি সংখ্যার উল্লেখ আছে। চিত্রটিকে ঘুরিয়ে দেখলে দেখা যাবে এটি '।— — —'। না এটি ১০০০ নয়। নির্দিষ্ট সংখ্যাটিতে আছে একটি উলম্ব এবং সেই সঙ্গে আনুভূমিক চিহ্ন। প্রথমটি '১' এবং দ্বিতীয়টি '০' (শূন্য)। '০' (শূন্য) থেকে '৯' পর্যন্ত ১০টি অঙ্কের সাহায্যে যে সংখ্যা নির্ণয় পদ্ধতি তাকে বলা হয় দশমিক পদ্ধতি। '০' (শূন্য) ও '১' মাত্র এই দুটি সংখ্যা অবলম্বনে সমস্ত সংখ্যা নির্ণয় করা চলে। এই পদ্ধতিকে বলা যায় দ্বিপদ পদ্ধতি (Binary system)। চিত্রে সেই পদ্ধতি অবলম্বনেই সংখ্যার নির্দেশ করা হয়েছে। এখানে সংখ্যাটি হল ৮। এই সংখ্যাকে দৈর্ঘ্যের একক ২১ সেন্টিমিটার দিয়ে

গুণ করলে একটি স্ত্রীলোকের গড় উচ্চতা পাওয়া যায় অর্থাৎ ১৬৮ সেন্টিমিটার বা প্রায় ৫'৫ ফুট। মহাকাশযানের দৈর্ঘ্যের সঙ্গে স্ত্রীলোকের উচ্চতার আনুপাতিক বিচারেও এই উচ্চতা নির্ণয় করা সম্ভব।

বহির্জাগতিক যে কোনো উন্নত সভ্যতা কি চিত্রটি থেকে এর সকল বক্তব্য উদ্ধার করতে সক্ষম হবে? বিজ্ঞানীদের অভিমত, হ্যাঁ সক্ষম হবে। মহাকাশযানের বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা এবং চিত্রটির বক্তব্য উপস্থাপনে বৈজ্ঞানিক যুক্তি লক্ষ্য করে বহির্জাগতিক সভ্যতা নিশ্চয় আমাদের প্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত অবস্থা সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট আভাস পাবে।

এবারে শনি গ্রহের কথা। সূর্যের থেকে দূরত্বের ক্রম অনুসারে শনি ষষ্ঠ গ্রহ। পৃথিবী থেকে এর সর্বনিম্ন দূরত্ব প্রায় ১২০ কোটি কিলোমিটার বা ৭৪ কোটি মাইল আকৃতির দিক দিয়ে সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থাৎ বৃহস্পতির পরের গ্রহ। শনি গ্রহের আকার পৃথিবীর আকারের ৭৪৩'৭ গুণ অর্থাৎ এর আয়তনের মধ্যে ৭৪৩টি পৃথিবীর স্থান সঙ্কুলান সম্ভব। নিরক্ষীয় অঞ্চল দিয়ে আবহমণ্ডল সমেত গ্রহটির ব্যাস প্রায় ১২১০ ০ কিলোমিটার বা ৭৫১০০ মাইল। কিন্তু গ্রহটি গঠনবৈচিত্র্যে কিছুটা চাপা বলে মেরু অঞ্চলের ব্যাস প্রায় ১১০০০০ কিলোমিটার বা ৬৭২০০ মাইলের মত। সূর্যকে কেন্দ্র করে শনির একটি আবর্তনকাল ২৯ বছর ৬ মাসের মতন এবং নিরক্ষীয় অঞ্চলে নিজের অক্ষের উপরে এর আবর্তন সময় ১০ ঘণ্টা ১৪ মিনিট। শনির ভর কত? পৃথিবীর ভর ১ ধরে শনির ভর ৯৫'১৪ এবং সূর্যের ভরের $\frac{1}{3500}$ অংশ। গ্রহটির ঘনত্ব অত্যন্ত অল্প, জলের ঘনত্বের '৭ ভাগ মাত্র।

শনি গ্রহ উপাদানের দিক দিয়ে কি রকম? গ্রহটি গ্যাসীয় উপাদানযুক্ত, অন্ততপক্ষে তার বহিরাবরণ তো বটেই এবং এই পৃথিবীর সঙ্গেও তার অল্পই মিল আছে।

শনি গ্রহের এই পরিবেশে জীবনের অস্তিত্ব কি সম্ভব?

এবার ইউরেনাস এবং নেপচুনের কথায় আসা যাক।

সূর্যের থেকে দূরত্বের দিক দিয়ে ইউরেনাস সপ্তম গ্রহ এবং সৌর-জগতের গ্রহগুলির মধ্যে এটি আকৃতির দিক দিয়ে তৃতীয় বৃহত্তম গ্রহ। সূর্য থেকে এর গড় দূরত্ব ২৮৮ কোটি কিলোমিটার অর্থাৎ প্রায় ১৮০ কোটি মাইল। নিরক্ষীয় অঞ্চল দিয়ে ইউরেনাসের ব্যাস সাধারণভাবে ৫২৭০০ কিলোমিটার বা ৩২৮০০ মাইল গ্রহণ করা যায়—প্রায় পৃথিবীর ব্যাসের চারগুণ এবং এর সূর্যকে প্রদক্ষিণকাল প্রায় ৮৪ বছর। গ্রহটির যে দিকটি সূর্যের দিকে আছে অর্থাৎ প্রত্যক্ষযোগ্য দিকটির বহির্আবহমণ্ডলের উত্তাপ—১৫০ ডিগ্রি থেকে—২০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে অর্থাৎ—২১০ ডিগরি থেকে—৩৫০ ডিগরি ফারেন-হাইটের মধ্যে নির্দিষ্ট থাকে। ইউরেনাসের ভর পৃথিবীর ভরের প্রায় ১৪·৫ গুণ এবং এটির পাঁচটি উপগ্রহের কথা আজ পর্যন্ত জানা গেছে।

ইউরেনাসের আবহমণ্ডলে কি আছে? হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম প্রধানত ইউরেনাসের আবহমণ্ডলে থাকা সম্ভব। কিন্তু মিথেন গ্যাসও কম থাকার কথা নয়। ইউরেনাসে কি জীবন আছে? প্রাকৃতিক গঠন বা উপাদানের দিক দিয়ে ইউরেনাস বৃহস্পতিরই সদৃশ। ফলে এই গ্রহটিতে জৈবিক অস্তিত্বের প্রশ্নে বৃহস্পতিকেই নির্দেশ করতে হয়।

সূর্যের থেকে দূরত্বের দিক দিয়ে নেপচুন অষ্টম গ্রহ। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে প্লুটো আবিষ্কারের পূর্বে নেপচুন ছিল সৌরজগতে পরিচিত সবচেয়ে বাইরের গ্রহটি। সূর্য থেকে পৃথিবী যত দূরে, সূর্য থেকে নেপচুনের দূরত্ব তার প্রায় ৩০ গুণ। অর্থাৎ সূর্য থেকে এর দূরত্ব সাড়ে ৪ শো কোটি কিলোমিটার বা প্রায় ২৮০ কোটি মাইল। আবহমণ্ডল সমেত নেপচুনের ব্যাস প্রায় ৫০৯৫০ কিলোমিটার বা ৩১৮৫০ মাইল। সূর্যকে কেন্দ্র করে এর একটি প্রদক্ষিণকাল ১৬৪·৮ বছর। হিসেব করে বিজ্ঞানীরা এরকম একটা সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করছেন যে, গ্রহটির কেন্দ্রে আছে ২০০০০ কিলোমিটার বা ১২০০০ মাইল ব্যাসযুক্ত শিলান্তর। একে আবৃত করে রেখেছে ১০০০০

কিলোমিটার বা প্রায় ৬০০০ মাইল গভীর বরফের আস্তরণ এবং তার ঊর্ধ্বে ৩০০০ কিলোমিটার বা ২০০০ মাইলের মত গ্যাসীয় মণ্ডল।

গ্রহটির ভর কত? পৃথিবীর ভর ১ ধরে নেপচুনের ভর ১৭'৪৬ এবং এর ঘনত্ব ইউরেনাসের ঘনত্বের খুব কাছে। ইউরেনাসের ঘনত্ব যেখানে প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে ১'৫৬ গ্রাম, নেপচুনের ঘনত্ব সেখানে ১'৫৪ গ্রাম। সূর্যকে কেন্দ্র করে অক্ষপথের উপরে এর গতিবেগ সেকেণ্ডে ৫'৪৪ কিলোমিটার। নেপচুনের দুটি উপগ্রহের কথা আজ পর্যন্ত জানা গেছে।

বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, প্রাকৃতিক গঠনের দিক দিয়ে নেপচুন অনেকটা বৃহস্পতি, শনি এবং ইউরেনাসের সমতুল।

সৌরজগতের নবম গ্রহ প্লুটো। সূর্য থেকে এর গড় দূরত্ব প্রায় ৫৯১ কোটি কিলোমিটার বা ৩৬৭ কোটি মাইল। প্লুটোর ব্যাস সম্ভবত ৫০০০ থেকে ৬০০০ কিলোমিটারের মধ্যে। সূর্যকে কেন্দ্র করে এর প্রদক্ষিণকাল ২৪৮'৫ বছর।

গ্রহটির ভর কত বলা কঠিন এবং এখনও পর্যন্ত এই গ্রহটির কোনো উপগ্রহের কথা জানা যায়নি। মুখ্য গ্রহগুলি থেকে প্লুটোর বিশেষ চারিত্রিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বিজ্ঞানীরা অনেকে মনে করেন যে, প্লুটো হয়তো প্রথমে সূর্যের কোনো গ্রহই ছিল না এবং হয়তো সে ছিল নেপচুনেরই একটি উপগ্রহ। প্লুটো গ্রহটিতে আবহমণ্ডল আছে কিনা বলা কঠিন। তবে সেখানে হিলিয়াম এবং নিওনের অস্তিত্ব থাকলেও থাকতে পারে।

প্লুটো গ্রহে কি জীবনের অস্তিত্বের সম্ভাবনা আছে? গ্রহটি সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্য এতই অকিঞ্চিৎকর যে আজও এ সম্পর্কে সুনিশ্চিতভাবে কিছু বলা কঠিন।

শুধু গ্রহের কথা নয়, আমাদের সৌরমণ্ডলেই বিভিন্ন গ্রহের অবস্থিতি ছাড়াও গ্রহগুলিকে কেন্দ্র করেও আবর্তনরত উপগ্রহ দেখা যায়। মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনি একাধিক উপগ্রহযুক্ত। আকৃতিতেও এগুলি নেহাৎ ছোট নয় ফলে এমন সম্ভাবনা যথেষ্ট যে, যখন একটি

বৃহৎ তারকার সৃষ্টি হয়, তখন সেটি গ্রহ-উপগ্রহ পরিবেষ্টিত হয়ে উঠতে পারে।

এখন পৃথিবীর সন্নিহিত অঞ্চলের তারকাগুলিকে দেখা যাক। পৃথিবী থেকে ১৫ আলোকবর্ষ ব্যাসার্ধের মধ্যে প্রায় ৪৫টি তারকা আছে। বিশ্লেষণে লক্ষ্য করা গেছে যে, এদের কয়েকটি সঙ্গীবিশিষ্ট। এরা দৃষ্টিগোচরীভূত নয়, অপরিলক্ষিত। সম্ভবত এরা গ্রহ। বার্নার্ডস তারকাটি উল্লেখ করবার মত একটি তারকা। এই তারকাটির একটি সঙ্গী আছে। সঙ্গীটি কি রকম? সামান্য সঙ্গী নয়, ভরের দিক দিয়ে এটি প্রায় বৃহস্পতির সমপর্যায়ভুক্ত।

কিভাবে এই অপরিলক্ষিত সঙ্গীটির অস্তিত্ব নির্ধারণ করা হয়? সঙ্গী তারকাটি মূল তারার উপরে যে মহাকর্ষীয় প্রভাব সৃষ্টি করে তা থেকেই এটি নির্ধারণ করা সম্ভব। মহাকাশে নিঃসঙ্গ তারকার রৈখিক গতি থাকে। যে তারকার সঙ্গী আছে ভরকেন্দ্রকে ঘিরে তার থাকবে একটি কক্ষীয় গতি। এই গতির জন্যে সঙ্গীটির অস্তিত্ব ধরা পড়ে। আমাদের পৃথিবী থেকে ১৫ আলোকবর্ষ ব্যাসার্ধের মধ্যে প্রায় ৪৫টি তারকার কয়েকটির এই গ্রহ জাতীয় সঙ্গী আছে। কিন্তু ৪৫ আলোকবর্ষ দূরত্বের বাইরে যে বহির্বিশ্ব, সেখানে?

আমাদের নক্ষত্রলোকে তারকাসংখ্যা প্রায় ১০০ লক্ষ কোটি। খুবই স্বাভাবিক যে, এই সব তারকার অনেকগুলিরই নিজস্ব গ্রহজগৎ আছে এবং সেখানে এমন গ্রহ থাকা সম্ভব যেখানে জীবন সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ থাকবে। হয়তো সে রকম গ্রহেরই সংখ্যা দশ লক্ষ। এ তো গেল কেবলমাত্র আমাদের নক্ষত্রলোকের কথা। ব্রহ্মাণ্ডে এই রকম নক্ষত্রলোকের সংখ্যা সীমাহীন, অনন্ত। তাহলে গণনায় গ্রহদের সর্বমোট যে সংখ্যায় আমরা পৌঁছোব, তার হিসেব করবে কে? সেই গ্রহদের মধ্যে একটিও কি পৃথিবীর মত নেই যেখানে বুদ্ধিজীবীদের বাস? মনুষ্যেতর বা মনুষ্য থেকে উন্নততর জীব অধ্যুষিত? হ্যাঁ, সে সম্ভাবনা প্রবলতম, প্রায় সুনিশ্চিত বলা চলে।

পঞ্চম অধ্যায়

একটি গ্রহ বাসোপযোগী, বুদ্ধিমান এবং প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন সভ্যতা অধ্যুষিত হওয়ার জন্যে কি কি শর্ত পূরণ করা আবশ্যক ? গ্রহমাত্রেই জীবন নেই, বুদ্ধিমান জীব তো দূরের কথা। সৌরলোকের একাধিক গ্রহের বেলায় আমরা তা দেখেছি। ফলে জীবন এবং তদুপরি বুদ্ধিমান জীব আছে এমন গ্রহের সন্ধানে অনেকগুলি সর্ত সমন্বিত একটি অনুকূল পরিবেশ প্রয়োজন।

এই ব্রহ্মাণ্ডে বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব আছে, এমন গ্রহের সংখ্যা কত ?

যে সব জ্যোতির্বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন, ব্রহ্মাণ্ডে বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব আকস্মিক এক দুর্ঘটনা নয়, তা বিস্তৃত এবং ব্যাপক, তাঁদের সংখ্যা কম হবে না। কোনো কোনো আশাবাদী জ্যোতির্বিজ্ঞানীর অভিমত, আমাদের নক্ষত্রলোকেই প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন সভ্যতার সংখ্যা ১০ লক্ষের মত হতে পারে। এবং আমাদের নক্ষত্রলোকে তারকার সংখ্যা যদি ১০ হাজার কোটি হয় তাহলে প্রায় প্রতি ১০০০০০ তারকার ক্ষেত্রে একটি প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন সভ্যতা থাকতে পারে। অবশ্য যাঁরা এতটা আশাবাদী নন, তাঁরা মনে করেন, প্রতি ৩০০০০০০ তারকায় একটি মাত্র প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন সভ্যতা অধ্যুষিত হবে এবং আমাদের নক্ষত্রলোকেই এ ধরণের সভ্যতার সংখ্যা প্রায় ৩৫০০০।

জীবনের অনুকূল পরিবেশ এবং বাসোপযোগী গ্রহের সন্ধানের আগে একটা কথা মনে রাখা দরকার। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে বা এক নক্ষত্রলোক থেকে অন্য নক্ষত্রলোকে যে উন্নত, বুদ্ধিমান এবং প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন সভ্যতার সন্ধানে মর্ত্যের বিজ্ঞানীরা সচেষ্ট আছেন, সে সভ্যতা যে, জীবনের রসায়নে এবং প্রকৃতিতে মনুষ্যসমাজের

অনুরূপ হবে এমনটি আশা করা সঙ্গত নয়। এই পৃথিবীতে একমাত্র হাইড্রো-কারবন ধারায় যে জীবনরূপ লক্ষ্য করা যায়, ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র যে সেই ধারাটি অনুসৃত হবে, এমন কথা বলা চলে না। বরং একাধিক বৈচিত্র্যই সেখানে নজরে আসা সম্ভব।

ব্রহ্মাণ্ডের অন্যত্র জীবন এবং জীবের অস্তিত্বের বিষয়ে যাঁরা চিন্তা-ভাবনা করেন, তাঁরা এই দিকটির কথা সংশ্লিষ্ট সবাইকে মনে করিয়ে দিতে চান। হতে পারে, সেই বুদ্ধিমান জীব আকারে একটি পোকা-মাকড়ের মত, কিন্তু এর সঙ্গে যুক্ত আছে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী মস্তিষ্ক; হতে পারে, জীবন আছে প্রাথমিক আদিরূপের পর্যায়ে, কিন্তু সেই প্রাথমিক পর্যায়ের মধ্যেই সে সর্বার্থে সম্পূর্ণ। আবার এমন হওয়াও সম্ভব, যে পরিবেশে এই পার্থিব জীবনের উদ্ভব এবং বিকাশ, বহির্জাগতিক কোনো সভ্যতার তা পরিপন্থী। তাহলে এমন কথা মনে করা অসঙ্গত, যে কোনো প্রকার জীবনই অক্সিজেননির্ভর হবে, তাপমাত্রার একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সে জীবন বিকশিত হবে এবং সর্বোপরি মানবজীবনের সৃষ্টি ও বিকাশে যা অপরিহার্য, ব্রহ্মাণ্ডের অন্যত্র জীবনের ক্ষেত্রে তাই একমাত্র অবলম্বনীয় হয়ে উঠবে। তবু বুদ্ধিমান জীবের অনুসন্ধানে আমাদের এক এবং অনন্য উদাহরণ আমরাই। তাহলে ব্রহ্মাণ্ডের অন্যত্র বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্বের বিচার বিশ্লেষণে যা আমাদের সর্বাধিক জ্ঞাত, তাকে অবলম্বন করে অগ্রসর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সেইজন্যে বহির্জগতে বুদ্ধিমান জীবের অনুসন্ধানরত বিশেষজ্ঞরা সূর্যের অনুরূপ তারকা এবং পৃথিবীর মত গ্রহের সন্ধান করছেন।

বাসোপযোগী গ্রহের ক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য নিয়ামক, কেন্দ্রীয় তারকা থেকে গ্রহের দূরত্ব অর্থাৎ যে তারকাকে কেন্দ্র করে একটি গ্রহের সৃষ্টি, জীবনের উৎপত্তি এবং জীবের বিকাশের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে সেই গ্রহ থেকে তারকার দূরত্ব। আমাদের পৃথিবী সূর্য থেকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থিত হওয়ার ফলে পার্থিব উত্তাপ উন্নত জীবন সৃষ্টির পরিপন্থী হয়ে ওঠেনি। সূর্যের আলোকোচ্ছ্বাসের মধ্যে যে গ্রহগুলি

আছে, সেখানে কোনো ধরণেরই জীবনের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। সূর্যের দূরবর্তী অঞ্চলে আলোকাভাবের মধ্যে যে সব গ্রহের অবস্থান, জীবনের আশা সেখানেও অকিঞ্চিৎকর। আসলে বাসোপযোগী হওয়ার জন্যে কোনো তারকার চতুর্দিকে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে গ্রহটির অবস্থিতি দরকার। এই অঞ্চলটিকে বলা চলতে পারে বাসযোগ্য অঞ্চল। আমাদের সূর্যের ক্ষেত্রে

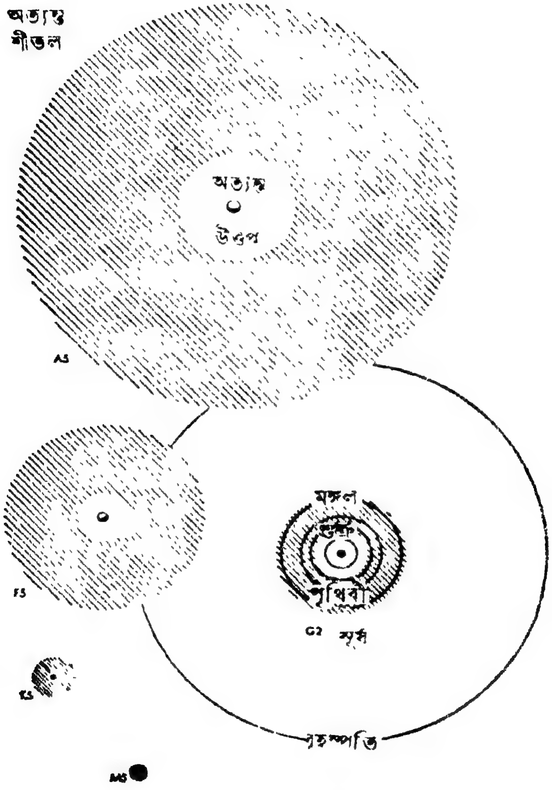

রেখাচ্ছন্ন ক্ষেত্র বসবাসযোগ্য অঞ্চলকে সূচিত করে। বিভিন্ন তারকার ক্ষেত্রে বসবাসযোগ্য অঞ্চলের পরিধি ভিন্ন। এই বসবাসযোগ্য অঞ্চলের মধ্যে কোথায় বুদ্ধিমান ও প্রযুক্তিজ্ঞান সম্পন্ন সভ্যতার অস্তিত্ব আছে, কে বলবে!

এই অঞ্চলটি শুক্রের কক্ষপথ থেকে মঙ্গলের কক্ষপথ পর্যন্ত বিস্তৃত। মঙ্গল আছে এই বাসযোগ্য অঞ্চলের প্রায় বহিপ্র্রান্তে এবং শুক্র প্রায় অন্তপ্র্রান্তসীমায়। যে তারকাকে ঘিরে গ্রহমণ্ডলী আবর্তনরত, সেই তারকা আকারে এবং ঔজ্জ্বল্যে যত বৃহৎ ও যত দীপ্তিময় হয়ে উঠবে, বাসযোগ্য অঞ্চল ততই দূরবর্তী ও প্রশস্ত হবে। অন্যদিকে, অনুজ্জ্বল ও ক্ষুদ্রাকৃতি তারকার ক্ষেত্রে বাসযোগ্য অঞ্চল হবে নিতান্ত অপরিসর এবং সংকীর্ণ।

কিন্তু বৃহত্তম তারকাগুলির ক্ষেত্রে একটি অসুবিধা আছে। বাসযোগ্য অঞ্চল প্রশস্ত হলে কি হবে, নক্ষত্রদের আয়ু অত্যন্ত স্বল্প। আবার অতি ক্ষুদ্র তারকার বাসযোগ্য অঞ্চল অত্যন্ত অপরিসর কিন্তু জীবন দীর্ঘ। উত্তাপের নিম্নাভিমুখী ক্রম অনুসারে তারকাদের একটি শ্রেণীবিভাগ আছে। শ্রেণীটি

O, B, A, F, G, K, M।

অতি উত্তপ্ত বৃহত্তর তারকাগুলি A। এবং অতি ক্ষুদ্র তারকা M পর্যায়ভুক্ত। আমাদের সূর্য G পর্যায়ের—বাসোপযোগী অঞ্চল এই G পর্যায়ের তারকার থাকার কথা। শুধু G নয়, G-এর বাসোপযোগী বৃহত্তর এবং ক্ষুদ্রতর দুটি প্রান্তসীমা যথাক্রমে F এবং K। এই সব তারকার গ্রহদের ক্ষেত্রে বাসোপযোগী অঞ্চল গড়ে ওঠার সম্ভাবনা সর্বাধিক।

কিন্তু আমাদের সূর্যের চারপাশে তারকাগুলির ক্ষেত্রে বাসোপযোগী অঞ্চল অনুসন্ধানের সময়ে একটা অসুবিধা দেখা দেয়। সূর্যের প্রতিবেশী যে সব তারকা আছে, তাদের অধিকাংশই সূর্যের মত নয়, বেশির ভাগই যুগ্ম তারকা বা তিন ও ততোধিক তারকার এক অদৃশ্য শৃঙ্খলে যুক্ত। যুগ্ম তারকার ক্ষেত্রে একটি গ্রহের কক্ষপথ হবে জটিল, তবু সেখানে জীবনের সম্ভাবনা একেবারে নেই, এমন বলা চলে না। যদি দুটি তারকার অন্তর্বর্তী দূরত্ব হয় অসম্ভব বেশি, তাহলে প্রতিটি তারকারই একটি সুস্থিত কক্ষপথে গ্রহ থাকা সম্ভব। তারকা দুটি আকারে আমাদের সূর্যের মত হলে এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত হবে?

সে দূরত্ব হবে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বর কমপক্ষে দশ গুণ। আর যদি তারকা দুটি পরস্পরের এমন নিকটবর্তী হয় যে, এদের কোনো গ্রহের কক্ষপথ বাসযোগ্য অঞ্চল অতিক্রম করে যায়, তাহলেও জীবনের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া চলে না। নিকটবর্তী যুগ্ম তারকাদের ক্ষেত্রে কোনো কোনো বিজ্ঞানী বলেন যে, এদের দূরত্ব পৃথিবী-সূর্যের দূরত্বের $\frac{1}{10}$ ভাগের বেশি হতে পারে না।

যদি পৃথিবীই জীবনের বিকাশের ক্ষেত্রে আদর্শ এবং একমাত্র দৃষ্টান্তস্থল হয়, তাহলে যে সব তারকাকে কেন্দ্র করে বুদ্ধিমান জীব অধ্যুষিত গ্রহগুলি গড়ে ওঠার কথা জীবনের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সময় দেওয়ার উদ্দেশ্যে, তাদের আয়ুষ্কাল ১০০০ কোটি বছরের মত হওয়া উচিত। আমাদের পৃথিবীর ক্ষেত্রে, জীবনের আদিরূপ সৃষ্টির রাসায়নিক বিক্রিয়ার পর্যায়টিতে কয়েক কোটি বছর সময় লাগতে পারে। কিন্তু এক কোষী আণুবীক্ষণিক জীবাণু থেকে বহু-কোষী জীবে রূপান্তরের পথটি আরও অতি দীর্ঘ। এটিতে সময়ের প্রয়োজন প্রায় ৪০০ কোটি বছরের মতন। আমাদের সূর্যের আয়ুষ্কাল প্রায় ১০০০ কোটি বছর। অর্থাৎ তার জীবদ্দশার প্রায় অর্ধেক অতিক্রান্ত হয়েছে। প্রাণের অভিব্যক্তির পর্যায়টি লক্ষ্য করে এমন অভিমত ব্যক্ত করা যায় যে, যদি অনুরূপ পদ্ধতিতে অন্য তারকার কোনো গ্রহে জীবনের বিকাশ হয়ে থাকে, তাহলে সেই তারকার জীবনকাল হবে অত্যন্ত দীর্ঘ; হয়তো বা কয়েক হাজার কোটি বছর। অবশ্য যদি কোনো আকস্মিকতায়, কোনো দৈব উপায়ে জীবিত অণুর সৃষ্টি হয় তো অন্য কথা।

কিন্তু জীবযুক্ত বা বাসোপযোগী যে গ্রহের সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা চিন্তা-ভাবনা করেন, সেই গ্রহটি আকারে-প্রকারে কি রকম হবে? যে তারকাটিকে কেন্দ্র করে এই গ্রহটির উৎপত্তি, প্রথমত সেই গ্রহটিকে এমন হতে হবে যে, তারকাটি থেকে তার নির্দিষ্ট দূরত্বেও সে একটি আবহমণ্ডল ধরে রাখতে সমর্থ হয়। বাসোপযোগী গ্রহের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে গ্রহের আকারও একটি প্রধান নিয়ামক। কিন্তু সে আকারই

সব নয়। আমাদের পৃথিবীর কথা ধরা যাক। বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বাঞ্চলে জলীয় বাষ্প হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন পরমাণুতে বিশ্লিষ্ট হচ্ছে। হাইড্রোজেন পরমাণুগুলি অত্যন্ত হালকা। সূর্যের উত্তাপে এদের কিছু কিছু অভিকর্ষ-বল অতিক্রম করছে। সুতরাং পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ অনির্দিষ্ট কালের জন্য হাইড্রোজেন আবহমণ্ডল ধরে রাখার ক্ষমতা-সম্পন্ন নয়। এই যে মাধ্যাকর্ষণ, এ পৃথিবীর ভরের উপর নির্ভরশীল। তাহলে পৃথিবীর ভরনির্ভর যে মাধ্যাকর্ষণ হাইড্রোজেন আবহমণ্ডল ধরে রাখতে অসমর্থ, সেই মাধ্যাকর্ষণ আমাদের জীবনের পক্ষে অপরিহার্য অক্সিজেনকে ধরে রাখবার শক্তিসম্পন্ন। অক্সিজেন আবহমণ্ডল যুক্ত যদি কোনো গ্রহের কথা চিন্তা করা যায়, তাহলে সে গ্রহ আকারে আমাদের পৃথিবীর মতনই ছোট হবে যাতে কালের ব্যবধানে এর মুক্ত হাইড্রোজেন মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে। বিজ্ঞানীরা হিসেব কষে দেখেছেন, একটি গ্রহ হাইড্রোজেনমুক্ত হওয়ার জন্যে এমন ছোট হবে অথচ অক্সিজেন ধরে রাখার জন্যে তার এমন আকার প্রয়োজন, যার ফলে তার ব্যাসার্ধ ১০০০ থেকে ২০০০০ কিলোমিটারের মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়।

বাসোপযোগী গ্রহের ক্ষেত্রে আরও কতকগুলি শর্ত আছে। এই সব গ্রহের কক্ষপথ কেমন হবে? গ্রহগুলির কক্ষপথ যদি খুব বেশি উৎকেন্দ্রিক হয়, তাহলে প্রাণসৃষ্টি এবং প্রাণবিকাশের পক্ষে এই জাতীয় গ্রহ উপযুক্ত বিবেচিত হওয়া কঠিন। অতিরিক্ত উৎকেন্দ্রিকতা-যুক্ত কক্ষপথের ক্ষেত্রে একটি সম্পূর্ণ আবর্তনের কোনো পর্বে, এই ধরণের গ্রহ কেন্দ্রীয় তারকার অত্যন্ত নিকটে আসবে। তখন আলো এবং তাপ পৌঁছোবে অত্যধিক মাত্রায়। আবার কেন্দ্রীয় তারকা থেকে যখন সে দূরতম অঞ্চলে সরে যাবে, তখন আলো এবং তাপ আসবে অত্যল্প পরিমাণে। আলো এবং তাপের এই বিরাট তারতম্য বাসোপযোগী গ্রহের অনুকূল নয়।

বাসোপযোগী গ্রহের ক্ষেত্রে বার্ষিক কক্ষপথ যেমন সর্তসাপেক্ষ, তেমনি জীবন এবং জীবের বিকাশের প্রয়োজনে আহ্নিক বেগ

সম্পর্কেও দু একটি কথা বলা দরকার। আপন অক্ষের উপরে একটি গ্রহের আবর্তনকাল কখনো কখনো কেন্দ্রীয় তারকাকে প্রদক্ষিণ-কালের সমান। এই সব ক্ষেত্রে গ্রহের একটি পৃষ্ঠভাগ বরাবর সূর্যের দিকে ফেরানো, অন্য পৃষ্ঠটি চিরকালের মত সূর্যের দিক থেকে মুখ লুকোনো। অর্থাৎ একটি পৃষ্ঠভাগ চিরশৈত্যের মধ্যে, চির অন্ধকারময়, অন্য পৃষ্ঠভাগ চির উত্তপ্ত, চির আলোকোচ্ছ্বল। শৈত্য ও উত্তাপের এই চূড়ান্ত পর্যায়ে এবং তাপমাত্রার এই প্রচণ্ড তারতম্যে আমাদের পরিচিত জীবনরূপ গড়ে ওঠা স্বাভাবিক নয়। জীবন এবং জীব আছে এমন কোনো গ্রহের অনুসন্ধানে যদি দেখা যায় যে, গ্রহটির আহ্নিক আবর্তনকাল বার্ষিক আবর্তনকালের সমান, তাহলে এ রকম একটি গ্রহ আমাদের কাছে আশার আলো নিয়ে পৌছোবে না।

এখানে আরও একটি কথা বলতে হবে। পৃথিবীর দিকে তাকালে আমরা দেখি তার অবর্তন-অক্ষ কক্ষপথতলের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট কোণ রচনা করেছে। যদি কক্ষপথ তলের উপরে একটি লম্ব টানা যায়, তাহলে আবর্তন-অক্ষ এই লম্বের সঙ্গে যে কোণ উৎপন্ন করে, তার পরিমাণ বেশি নয়, সরল হিসেবে সাড়ে ২৩ ডিগরির সমান। আবর্তন অক্ষের এই নতির জন্যে সূর্যের রশ্মি পৃথিবীপৃষ্ঠে সাধারণভাবে সরাসরি এসে পড়ে না। ফলে দিন ও রাত্রির তাপমাত্রার তেমন একটা পার্থক্য ঘটে না। জটিল প্রাণসৃষ্টির ক্ষেত্রে তাপমাত্রার এই পরিবেশটি অনুকুল। ফলে বাসোপযোগী গ্রহের ক্ষেত্রে আবর্তনপথ এবং কক্ষপথ তলের অন্তর্ভুক্ত কোণের একটি ভূমিকা থেকে যায়।

যে কোনো গ্রহে জটিল প্রাণসৃষ্টিতে তার চৌম্বক ক্ষেত্রেরও যে একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে পৃথিবীর দিকে তাকালে সে কথা আমরা বুঝতে পারি। আমাদের পৃথিবীর বেলায় তার চুম্বক রশ্মির আস্তরণটি মহাকাশে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে পরিব্যাপ্ত। মায়ের অদৃশ্য আশীর্বাদ যেমন সমস্ত অমঙ্গল থেকে আমাদের নিয়ত রক্ষা করে, তেমনি এই অপ্রত্যক্ষ চুম্বকরশ্মির আস্তরণ মহাজাগতিক রশ্মিকণা থেকে পৃথিবীকে সর্বদা পরিত্রাণ করে। যদি আশীর্বাদরূপ চুম্বকরশ্মির

এই আস্তরণটি না থাকত তা হলে এই ধরিত্রীপৃষ্ঠে আমাদের মত বুদ্ধিমান জীবের বিকাশ অসম্ভব হয়ে উঠত। ব্রহ্মাণ্ডে বাসোপযোগী গ্রহের সৃষ্টিতে এই চৌম্বক ক্ষেত্রের একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে।

বাসোপযোগী হয়ে উঠতে গেলে, একটি গ্রহের আরও দু একটি শর্ত পূরণ করা আবশ্যক। এর একটি সৌর বিকিরণ সংক্রান্ত। কোনো গ্রহে উন্নত প্রাণসৃষ্টির ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজনে সূর্য-রূপ কেন্দ্রীয় তারকাটির বিকিরণের পরিমাণ অতি দীর্ঘকাল একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় থাকা প্রয়োজন। তা ছাড়া আর একটি বিষয় হল, কারবন। পৃথিবীতে যে সব ভারি উপাদান পাওয়া যায় একটি গ্রহের রাসায়নিক উপাদানে যদি সেই সব পদার্থের প্রাচুর্য না থাকে, তাহলে জীবনের সৃষ্টি হবে কী করে? এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল কারবন।

কে জানে, এই সব আরোপিত সর্তকে পূরণ করে নিষ্ঠা এবং গাণিতিক নিয়ম অনুসরণে গড়ে ওঠা বাসোপযোগী ও বুদ্ধিমান জীব অধ্যুষিত কত গ্রহ এই ব্রহ্মাণ্ডে আপন তারকাকে কেন্দ্র করে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে আবর্তন করে চলেছে! কবে এবং কি ভাবে সেই সব তারকার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ স্থাপিত হবে, কে বলবে?

ষষ্ঠ অধ্যায়

উন্নত এবং বুদ্ধিমান জীবের অনুসন্ধানে দুটি দিকের কথা ভেবে দেখতে হবে। প্রথম : জীবনের সৃষ্টিতে পরিবেশগত সর্ত—সে সর্ত জীবনকে প্রতিপালন করবে, তাকে পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যাবে। দ্বিতীয় : ব্রহ্মাণ্ডের অন্য কোথাও সে রকম অনুকূল কোনো পরিবেশ আছে কি না।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, আছে। আমাদের নক্ষত্রলোকেই হাজার কোটি তারকা আছে। এই সব তারকাদের ঘিরে আবর্তনরত যে গ্রহকুল, তাদের মধ্যে বসবাসের উপযুক্ত পরিবেশ থাকা খুবই সম্ভব। আমাদের নক্ষত্রলোকে সূর্যকে ঘিরে মনুষ্য অধ্যুষিত পৃথিবী সেই রকমই একটি গ্রহ।

আমাদের নক্ষত্রলোকে উন্নত প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন জীবন আছে কি নেই কয়েকটি বিষয়ের উপরে তা নির্ভর করে। সে সব বিষয় অবশ্যই বিতর্কমূলক। আমেরিকান জ্যোতির্পদার্থবিদ্ ফ্রাঙ্ক ড্রেক একটি সূত্র উদ্ভাবন করেন। ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দের শেষে গ্রীণ ব্যাঙ্কের মানমন্দিরে যে সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়, সেই সম্মিলনে ড্রেক এই সূত্রটি উল্লেখ করেন।

সম্মিলনে বিখ্যাত ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটেছিল। এঁদের মধ্যে ছিলেন অটো স্ট্রুভে, মেল্ভিন, ককোনি, ফ্রাঙ্ক ড্রেক, সু-শু-হুয়াং, জন সি লিলি, ফিলিপি মরিসন, বারনারড এম অলিভার ও কারল সাগান। বহির্জাগতিক জীবের অস্তিত্ব এবং আন্তগ্র্হ যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এঁদের প্রত্যেকেরই অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য অবদান আছে।

ড্রেক বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের সমাবেশে ব্ল্যাক বোরডে সরল সূত্রটি

লিখলেন একটি সমীকরণের আকারে। সাতটি নিয়ামকযুক্ত সূত্রটি নিম্নরূপ :

আমাদের নক্ষত্রলোকে অদ্যাপি বিদ্যমান সভ্যতার সংখ্যা যদি 'স' হয় তাহলে

স = ক × খ × গ × ঘ × ঙ × চ × ছ

এখানে,

ক = আমাদের নক্ষত্রলোকের কালদ্দশায় তারকা গঠনের গড় হার

খ = গ্রহমণ্ডলীযুক্ত তারকাভাগ

গ = জীবনের সৃষ্টি এবং বিকাশ পরিবেশগতভাবে সম্ভব প্রতি তারকা পিছু এরকম গ্রহদের গড় সংখ্যা

ঘ = বস্তুত জীবন সৃষ্টি হয়েছে এমন গ্রহভাগ

ঙ = বুদ্ধিমান জীব আছে এমন গ্রহভাগ

চ = যোগাযোগে আগ্রহী ও যোগাযোগে সক্ষম, উন্নত এবং প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন সভ্যতা আছে এমন গ্রহভাগ বা অংশ

ছ = এই জাতীয় সভ্যতার গড় অস্তিত্বের কাল।

তাহলে আমাদের নক্ষত্রলোকে বুদ্ধিমান সভ্যতার সংখ্যা সাতটি নিয়ামকের গুণফলের সমান। সংখ্যাটি যদি বৃহৎ কোনো সংখ্যা হয়, তাহলে সম্ভাবনা আশাপ্রদ বটে, আমাদের নক্ষত্রলোকের সন্নিহিত অংশেই আমরা অন্য কোনো সভ্যতাকে আশা করতে পারি। অন্যদিকে সংখ্যাটি যদি ক্ষুদ্র হয়, তাহলে কয়েকটি মাত্র সভ্যতাই থাকতে পারে, যে সব সভ্যতা বহু সহস্র আলোকবর্ষের ব্যবধানে অবস্থিত। অসংখ্য সৌরজগতের মধ্যে তাদের অনুসন্ধান দুঃসাধ্য।

এইবার হিসেব করে দেখা যাক, এই জাতীয় সভ্যতার সংখ্যা কত হতে পারে।

আমাদের নক্ষত্রলোকে তারকার সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার কোটির মত। নক্ষত্রলোকের আয়ু প্রায় এক হাজার কোটি বছর।

এখন ক এর মান কত ধরা হবে? বার্ষিক ১০টি তারকা অসমীচীন

হবে বলে মনে হয় না। এবারে খ এবং গ-এর মান হিসেব করা যাক। খ যেখানে গ্রহমণ্ডলীযুক্ত তারকাভাগ অর্থাৎ নক্ষত্রলোকের মধ্যে গ্রহমণ্ডলীযুক্ত তারকাভাগ সমগ্রের যে ভগ্নাংশ, গ সেখানে জীবনের সৃষ্টি এবং বিকাশ পরিবেশগতভাবে সম্ভব এরকম প্রতি তারকা পিছু গ্রহদের গড় সংখ্যা নির্দেশ করে। বিজ্ঞানীরা খ এবং গ-এর মান স্বতন্ত্রভাবে ধরেন নি। গ্রহজগতের উৎপত্তি ব্রহ্মাণ্ডে যে স্বাভাবিক ধর্ম তা তাঁরা লক্ষ্য করলেন। আমাদের সৌরজগতেই বৃহস্পতির আছে ১২টি উপগ্রহ, শনির ১০টি, ইউরেনাসের ৫টি—প্রত্যেকটি যেন সৌরজগতের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। এ কথা আজ পর্যন্ত জানা সম্ভব হয়নি যে, আমাদের সৌরজগৎ ছাড়িয়ে আমরা যদি অন্য সৌরজগতে যাই, সেখানে কেন্দ্রীয় সূর্য থেকে গ্রহদের দূরত্বের বিন্যাস কি রকম বা যে তারকাটি কেন্দ্রে অবস্থিত সেই তারকার ঔজ্জ্বল্যের উপরে তা কতটা নির্ভরশীল? গ্রহদের জীবন সৃষ্টিতে কেন্দ্রীভূত তারকাটির যে উত্তাপ গ্রহদের পৃষ্ঠদেশে এসে পড়ে, তার একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। অবশ্য জীবন সৃষ্টিতে কেবল একটি নির্দিষ্ট মাত্রার উত্তাপ প্রয়োজন—এমন নয়, উত্তাপের একটি ব্যাপক সীমার মধ্যে জীবনের সৃষ্টি এবং বিকাশ সম্ভব। এই সব কথা মনে রেখে বিজ্ঞানীরা খ এবং গ-এর গুণফলকে (খ × গ) ১ হিসেবে অনুমান করেছেন।

এরপর ঘ-এর কথা। ঘ-এর মাত্রা কত ধরা হবে? সমগ্র গ্রহজগতের মধ্যে বস্তুত জীবন সৃষ্টি হয়েছে এমন গ্রহভাগই ঘ। পৃথিবীতে জীবন সৃষ্টির যে ইতিহাস পাওয়া যায় এবং যে আদিম পরিবেশে জীবন সৃষ্টি হয়েছিল গবেষণাগারে জীবন সৃষ্টির সেই পরিবেশ তৈরী করে যত সহজে জীবন সৃষ্টির প্রয়োজনীয় জৈবিক অণু তৈরী হয়, তার ভিত্তিতে অন্যান্য গ্রহে লক্ষ কোটি বছরের ইতিহাসে জীবন সৃষ্টির সম্ভাবনা উজ্জ্বল বলে বিজ্ঞানীরা বিশেষভাবে মনে করেছেন। সেইজন্যে ঘ-এর মান ১ হবে বলে কোনো কোনো বিজ্ঞানী অভিমত পোষণ করেন।

অসুবিধা ঙ এবং চ নিয়ে। যে সব নিয়ামক অবলম্বনে ঙ এবং চ-

এর মান নির্ণয় করা যায়, সেগুলি আরও অনিশ্চিত। ঙ-এর ক্ষেত্রে আছে বুদ্ধিমত্তার দিকটি। আমাদের নক্ষত্রলোকে বিভিন্ন গ্রহের মধ্যে বুদ্ধিমান জীব আছে এমন গ্রহের অংশই ঙ। এবং বুদ্ধিমানের পরিবর্তে প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন এমন জীব চ। একথা ঠিক যে বুদ্ধিমান জীব মাত্রই প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন নয়। আমাদের মর্ত্যলোকে মানুষ একমাত্র প্রাণী যা বুদ্ধিমান এবং প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন। কিন্তু প্রযুক্তিজ্ঞানহীন বুদ্ধিমান প্রাণীর অভাব নেই। জলচর ডলফিন এ রকম একটি জীব। এদের বুদ্ধি অত্যন্ত উন্নত, সে উন্নতি বিচিত্র ধরনের হলেও হয়তো বা সে আমাদের পর্যায়েরই। কে জানে ভবিষ্যতে আমরা একদিন এদের সঙ্গে ভাব-বিনিময়ও করতে পারি।

কিন্তু এই ডলফিন জাতীয় বুদ্ধিমান প্রাণী যদি অন্য কোনো জগতে বাস করে এবং সেই জগৎ যদি সম্পূর্ণ জলে আবৃত হয়, তাহলে কি তাদের পক্ষে আমাদের মত অন্য গ্রহবাসী সভ্যতার সঙ্গে যোগা-যোগ করা সম্ভব? ডলফিন-সভ্যতা কি আমাদের উদ্দেশ্যে সঙ্কেত প্রেরণ করতে পারে? সম্ভবত নয়। বিজ্ঞানীদের অনুমান, জলজ কোনো সভ্যতার পক্ষে এই জাতীয় সঙ্কেত প্রেরণের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

কিন্তু এখানে বলবার মত আরও একটি বিষয় আছে। উন্নত এবং প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন যে সব সভ্যতার কথা চিন্তা করা হয়, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগে তারা কতটা আগ্রহী হবে? বহির্জাগতিক যোগা-যোগের ক্ষেত্রে কতটা কৌতূহলী হয়ে উঠবে? যোগাযোগে সক্ষম হলেই যে যোগাযোগে তৎপরতা দেখা দেবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। যদি কোনো সভ্যতা দারিদ্র্য দূর করে, রোগ নির্মূল করে, পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদন করে, লোকসংখ্যাকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে সেই সঙ্গে তার জীবন-আয়ু বাড়িয়ে তোলে, দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা ও শ্রম সাধ্যমত কমিয়ে আনে, তাহলে তাদের মানসিক অবস্থা কি রকম হবে? চিরসুখী জন হয়ে সে সভ্যতা কি অলস এবং অবসন্ন হয়ে

পড়বে ? অনুসন্ধিৎসা লুপ্ত হবে, মানসিক বৃত্তিগুলির চর্চা বন্ধ থাকবে ?

আজ পর্যন্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার যতটা বিকাশ, তা প্রধানত দুটি কারণের জন্যে। এক : শক্তিতে বৃহত্তর হয়ে ওঠার স্পর্ধা, দুই : জীবনকে স্বচ্ছন্দ করার আগ্রহ। সময়মত নিয়ন্ত্রিত না হলে উভয়ই ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করে। তাহলে মানবসভ্যতাও কি একদিন এই মৃত্যুর মুখোমুখী এসে দাঁড়াবে ?

কিন্তু মানবসভ্যতার কথা এখন থাক। মর্ত্যের পরিমণ্ডল অতিক্রম করে অনন্ত শূন্যে যে বহির্জাগতিক সভ্যতার কথা আমরা চিন্তা করছি, বিজ্ঞানের সাফল্যে সম্পূর্ণভাবে পরিতৃপ্ত হয়ে আজ কি সে মৃত্যুর মুখোমুখি ? না কি কৌতূহল শাশ্বত, তার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। মর্ত্যে মানবসভ্যতার সাফল্যের ইতিহাস থেকে আমরা এমন কথা জানি, বুদ্ধিমত্তার যে সাফল্য কৌতূহলই সেখানে চাবিকাঠি। তাহলে কৌতূহলের নিরসন বুদ্ধিমত্তার মৃত্যুর সমতুল।

বিজ্ঞানে চূড়ান্ত সফল বহির্জাগতিক এক সভ্যতার ক্ষেত্রে কি সকল কৌতূহলের অবসান ঘটবে ?

যে সব জীববিজ্ঞানী সৃষ্টিতত্ত্বের হিসাব নিকাশ রাখেন তাঁদের কেউ কেউ এমন কথা বলেন যে, ঙ এবং চ-কে গুণ করে গুণফল ১০০ এর মত ধরা চলে।

এরপরে সর্বশেষ নিয়ামক ছ। ছ-কে আমরা বলেছি এই জাতীয় সভ্যতার গড় অস্তিত্বের কাল। আমাদের নক্ষত্রলোকে এই জাতীয় সভ্যতার গড় অস্তিত্বের কাল নির্ণয় করা আরও দুরূহ। আমাদের চিন্তার পরিমণ্ডলে মানুষ ছাড়া আর তো এ জাতীয় দ্বিতীয় কোনো সভ্যতার নজীর নেই। যে সভ্যতাকে আমরা দেখেছি প্রযুক্তিজ্ঞান-সম্পন্ন সে সভ্যতার অস্তিত্বের কাল কত ? পৃথিবীর ইতিহাস এমন কথা জোর দিয়ে বলে না যে, সেখানে পারস্পরিক সংঘর্ষ নেই, হানা-হানি নেই, ধ্বংস সেখানে এমন এক শব্দ যা তার চরিত্রকে কলুষিত করে ! তা ছাড়া প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন সভ্যতা বলতে আমরা কি বুঝব ? আন্তর্জাতিক বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থায় সক্ষম এমন সভ্যতাই কি

কেবলমাত্র প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন সভ্যতা? তাহলে তো আমাদের প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন সভ্যতার বয়স দাঁড়ায় মাত্র কয়েক দশক। আর ধ্বংস যদি এমন পরিণতি নিয়ে আসে যে, প্রযুক্তিজ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন হয়ে ওঠার গড়ে ১০ বছরের মধ্যেই সে সভ্যতার মৃত্যু ঘটে, তবে ছ-এর মান দাঁড়ায় মাত্র ১০। আর ছ-এর মান যদি মাত্র ১০ ধরি, তাহলে যে সূত্র পূর্বে উল্লেখ করেছি সেই সূত্রের সাহায্যে, আমাদের নক্ষত্র-লোকে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিদ্যমান সভ্যতার সংখ্যা মাত্র ১ এবং বলা বাহুল্য সে সভ্যতা আমাদের পার্থিব সভ্যতা। কিন্তু প্রযুক্তিজ্ঞান কথাটির অর্থকে আমরা যদি একটু উদার করে দেখি, সে সভ্যলোকে যদি অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয়, যদি তারা আত্ম-হননকে এড়িয়ে চলে, তাহলে প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন সভ্যতার অস্তিত্ব দীর্ঘকালের। তাহলে আমাদের নক্ষত্রলোকে প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন সভ্যতার সংখ্যা অনেক এবং সে সভ্যতা হয়তো লক্ষ কোটিরও সমান। যদি মহাশূন্যে তাদের অবস্থান একেবারেই বিশৃঙ্খল বা নিয়ম ছাড়া হয়, তাহলে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে যে সভ্যতাটি আছে তারই দূরত্ব হবে কয়েক শো আলোকবর্ষের সমান। অবশ্য এ সব সিদ্ধান্ত অনুমান-সাপেক্ষ এবং অনির্ভর।

যদি বহির্বিশ্বে প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন অন্য সভ্যতার সঙ্গে কোনোদিন যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়? সূত্রে ছ-এর কথা বাদ দিলেও আমরা এই সিদ্ধান্তে নিশ্চয়ই আসতে পারি যে, আমাদের নক্ষত্রলোকে প্রতি ১০ বছরে মোটামুটি একটি প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন সভ্যতার সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে মানব-সভ্যতা বহির্বিশ্বে যদি প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন কোনো সভ্যতার একদিন সন্ধান পায় এবং সে সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে, তাহলে খুব সম্ভব সে অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করবে যে, পার্থিব যে সভ্যতা সম্পর্কে তার দম্ভ এবং গর্ব সে সভ্যতা তুলনায় একেবারেই অকিঞ্চিৎকর। গত কয়েক শো বছরে আমাদের পৃথিবীতে সভ্যতার যে অগ্রগতি তা দেখে আগামী কয়েক শো বছর পরে প্রযুক্তিবিজ্ঞানের দিক দিয়ে আমরা যে কোথায় গিয়ে পৌঁছোবো তা

কি কেউ অনুমান করতে পারি? আজকের পার্থিব সভ্যতা তার চূড়ান্ত রূপ নয়। যদি এমন কোনো সভ্যতা থাকে, যে সভ্যতা আজ অগ্রগতির শীর্ষে গিয়ে পৌঁচেছে তার বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির জ্ঞান হয় তো বিংশ শতাব্দীর মানুষের কাছে সম্পূর্ণই অকল্পনীয়। তবু মানবসভ্যতা যে একেবারেই পিছিয়ে আছে এমন কথাও বলা যায় না।

সপ্তম অধ্যায়

উন্নত সভ্যতাযুক্ত যে সব গ্রহের কথা বিজ্ঞানীরা চিন্তা-ভাবনা করছেন, আমরা মর্ত্যলোকবাসীরা কিভাবে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব? আজ থেকে প্রায় ২০ বছর আগে ১৯৫৯ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর নেচার (Nature) পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বিজ্ঞানীসমাজ সচকিত হয়ে উঠেছিলেন। প্রবন্ধটির লেখক দুজন বিশিষ্ট পদার্থবিদ্। এই প্রবন্ধে তাঁরা এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, হয়তো দূরবর্তী অন্য কোনো সৌরপরিবারের বাসিন্দারা এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করছে সবাধিক সংবহনক্ষম কোনো বেতার-তরঙ্গের মাধ্যমে। আমাদেরও উচিত, নিকটবর্তী সম্ভাবনাময় তারকাদের প্রতি বেতার দূরবীক্ষণকে স্থাপন করা। যদি সত্যিই কোনো সংকেত আসে ওই সব তারকা থেকে, তাহলে সেই সংকেত ধরা পড়বে, দুটি সভ্যতার ইতিহাসে সর্বাধিক বিস্ময়কর অধ্যায়টির সূচনা হবে।

বস্তুত বহির্জাগতিক বিভিন্ন সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগের বিষয়টি বেতার-তরঙ্গ আবিষ্কারের বহু পূর্ব থেকেই আলোচিত হয়ে আসছে। যখন কট্টরপন্থী বিজ্ঞানীরা মনে করতেন মঙ্গলগ্রহে বুদ্ধিমান জীব অবস্থান করছেন, তখন পৃথিবীর বুকে আমাদের মত সভ্যতার অস্তিত্বের পরিচয় কি ভাবে অন্য গ্রহবাসীদের কাছে পৌছে দেওয়া যায়, তা নিয়ে নানা মহলে চিন্তা ভাবনা হত। গত শতাব্দীতে গাণিতিক কারল ফ্রেডরিখ গস (Karl Friedrich Gauss) সাইবেরিয়াতে একটি বিরাট সমকোণী ত্রিভুজের আকৃতিতে জঙ্গল স্থাপনের প্রস্তাব করেন। বলা হয়, সুষম বর্ণযুক্ত করার জন্যে ত্রিভুজের অন্তর্ক্ষেত্রে গমের চারা রোপণ করা হবে। এই সমকোণী

ত্রিভুজের সঙ্গে পিথাগোরাসের (Pythagoras) বিখ্যাত উপপাদ্যটি সন্নিবেশিত করার পরিকল্পনাও করা হয়।

পিথাগোরাসের উপপাদ্যটি কি ?

সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গ অন্য দুই বাহুর উপরে অঙ্কিত বর্গের যোগফলের সমান। এই সত্যের উপরে ভিত্তি করে সমকোণী ত্রিভুজের প্রতিটি বাহুর উপরে একটি বর্গ স্থাপন করে সমকোণী ত্রিভুজটিকে আরও বিজ্ঞানোন্নত করা যায় কি না, ভাবনা-চিন্তা চলে।

কেউ আবার সাহারা মরুভূমির বুকে জ্যামিতিক আকৃতিযুক্ত দীর্ঘ খাল খনন করার কথা বলেন। সেই খালের জলে রাত্রির গভীর অন্ধকারে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। কেউ বা বিরাট আকৃতির আয়নার কথা ভাবলেন। সূর্যের প্রতিবিম্বিত রশ্মি মঙ্গললোকবাসীদের কাছে পৃথিবীর বুকে আমাদের মত বুদ্ধিমান জীবের পরিচয় দেবে বলে তাঁরা মনে করেন।

এই জাতীয় প্রাথমিক এবং স্থূল চিন্তার অনেক পরিবর্তন ঘটে বেতার-তরঙ্গ আবিষ্কারের পরে। বাস্তবিক এই তরঙ্গ আবিষ্কৃত হওয়ার পরে আন্তগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থায় একটি আদর্শ মাধ্যম হিসেবে এটি গৃহীত হবার সম্ভাবনা দেখা দিল। মহাজাগতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন পথের নিশানা এল।

কিন্তু যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে যদি বেতার-তরঙ্গকে নির্বাচন করা হয়, তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায়। কোন্ নির্দিষ্ট তরঙ্গকে আমরা অবলম্বন করব ? সেই তরঙ্গের কম্পন-সংখ্যা কত ? তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কি হবে ? যে কোনো কম্পনসংখ্যার একটি তরঙ্গ কি যথেষ্ট ?

না, তা নয়। যোগাযোগের জন্যে যে অর্থবহ সঙ্কেত এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে প্রেরিত হবে, এক সভ্যতার কাছ থেকে অন্য সভ্যতার কাছে, কোন্ কম্পন-সংখ্যায় সেই অর্থবহ সঙ্কেতটি আসছে, না জানতে পারলে তার মর্মোদ্ধার করা সহজ হবে না। আমাদের মর্ত্যলোক-বাসীদের পক্ষে নয়, অন্য গ্রহের বুদ্ধিমান জীবেদের পক্ষেও নয়।

তখন সেই চিরন্তন প্রশ্নটি বিজ্ঞানীসমাজকে আলোড়িত করল। তাহলে ? কী করণীয় এক্ষেত্রে। একটি মানুষের জাত-ধর্ম, আকার-প্রকৃতি না জানলে, লক্ষ কোটি মানুষের ভীড়ের ভেতর থেকে আসল মানুষটিকে চিনে নেব কী করে ?

বিজ্ঞানীরা একটি আদর্শ বেতার-তরঙ্গের সন্ধান করলেন। সে বেতার-তরঙ্গ এমন হতে হবে যা শুধু মানবসভ্যতার কাছে নয়, ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত সভ্যতার কাছেই যা নিশ্চয় পরিচিত হবে। সহজ কথা নয়। তবু বিজ্ঞানীরা এরকম একটি বেতার-তরঙ্গ আবিষ্কার করলেন। হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে সেই বেতার-তরঙ্গের বিকিরণ ঘটে। এর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ২১ সেন্টিমিটার এবং কম্পন-সংখ্যা প্রতি সেকেণ্ডে ১৪২০ মেগাহার্জ বা ১৪২০০০০০০০ বার। এই ব্রহ্মাণ্ডে মহাশূন্যতার মধ্যে পরিব্যাপ্ত হাইড্রোজেন পরমাণুরাও এই বিশেষ তরঙ্গটি তৈরী করে চলেছে। আমরা সৌভাগ্যবান, ব্রহ্মাণ্ডের অসীম শূন্যতার ভেতর দিয়ে এই বেতার-তরঙ্গ অবাধে যাতায়াত করতে পারে এবং পৃথিবীর আবহমণ্ডলের উচ্চস্তরেও তা বাধাপ্রাপ্ত হয় না।

এই যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গামা-রশ্মিকেও মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। মহাকাশে গামা-রশ্মির বিকিরণ একটি বিরল ঘটনা। ফলে কোথাও যদি অপ্রত্যাশিতভাবে গামা-রশ্মির উৎসের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়, তাহলে কোনো অত্যাশ্চর্যের খোঁজে সেখানে একটু সতর্ক দৃষ্টি দিলে মন্দ হয় না। কিন্তু মহাশূন্যে গামা-রশ্মি প্রেরণ বা গ্রহণ কোনোটিই সহজ কাজ নয়।

যোগাযোগের ক্ষেত্রে অবশ্য আরও কোনো কোনো মাধ্যমের কথা বলা যায় এবং কোনো মাধ্যমটিই অনুল্লেখ্য নয়। এর একটির নাম লেসার। আধুনিক আলোক-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে লেসার এক অতি বিস্ময়কর আবিষ্কার। ইংরেজিতে কথাটি LASER কিন্তু এই শব্দ Light amplification by stimulated emission of radiation-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। সাধরণ আলোক-উৎসের মত এ

নয়। এ এমন একটি উৎস যা একটি মাত্র বিশুদ্ধ বর্ণবিশিষ্ট আলো উৎপন্ন করছে। তা ছাড়া পরিচিত আলোক-উৎসগুলিতে যে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সৃষ্টি হচ্ছে, লেসারের ক্ষেত্রে তার সঙ্গে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যায়। লেসারে এই তরঙ্গগুলি অত্যন্ত সুসমঞ্জস—শান্ত সমুদ্র-পৃষ্ঠের ছন্দবদ্ধ উর্মিমালার মত লেসার-তরঙ্গের এই বৈশিষ্ট্য বেতার-তরঙ্গেরও আছে। সেই জন্যে বেতার-তরঙ্গে যেমন গান আমার যায় ভেসে যায়, লেসার-তরঙ্গেও তা সম্ভব। তবে লেসার-তরঙ্গের কম্পন-সংখ্যা বেতার-তরঙ্গের চেয়ে কয়েক কোটি গুণ বেশি। ফলে তথ্য পরিবহনে সে হবে অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন এবং কার্যকরী।

যোগাযোগের ক্ষেত্রে লেসারের উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে মেসারের কথাও বলা প্রয়োজন। মেসারের ইংরেজি রূপ MASER এবং এই কথাটি এসেছে Microwave amplification by stimulated emission of radiation থেকে। লেসার এবং মেসার রশ্মির মধ্যে পার্থক্য, এরা বর্ণালীর ভিন্ন ভিন্ন অংশে সক্রিয়। মেসার কার্যকর বেতার-বর্ণালীতে এবং লেসার আলোক-বর্ণালীতে। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন, মেসারের আবিষ্কার লেসারের পূর্বে হলেও লেসার অধিকতর ব্যবহারোপযোগী।

কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডে দূরবর্তী কোনো বুদ্ধিমান এবং প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন সভ্যতার সঙ্গে লেসার-মাধ্যমে যোগাযোগের পূর্বে লেসারের কার্য-কারিতার অনেক উন্নতিসাধন প্রয়োজন।

তাহলে সব দিক বিবেচনা করে বেতার সঙ্কেতই হল এখন পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য এক আদর্শ মাধ্যম।

এখন এই আন্তর্জাতিক, না আন্তর্জাতিক নয়, আন্তর্মহাজাগতিক বেতার-সঙ্কেত নিয়ে আমরা কি অন্য লোকবাসীদের সঙ্গে যোগা-যোগের চেষ্টা করব, না কি অন্য নক্ষত্রলোকে যুক্ত কোনো গ্রহের বুদ্ধিমান জীব যদি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে তো সেই সঙ্কেতের আমরা অনুসন্ধান করব?

১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে নিউ ইয়র্কের করনেল বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন পদার্থ-

বিদ্ ককোনি (Giuseppe Cocconi) এবং মরিসনের (Philip Morrison) মনে হয়েছিল, যোগাযোগের জন্যে উদ্যোগী হয়ে সঙ্কেত প্রেরণ না করে আমাদেরই কোনো এক তারকার সম্ভাব্যময় কোনো গ্রহ প্রেরিত অর্থবহ সঙ্কেতের খোঁজ করা ভাল।

যে বেতার-তরঙ্গ মহাশূন্য এবং আমাদের পৃথিবীর মত গ্রহের আবহমণ্ডলের ভেতর দিয়ে স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করতে পারে, তার কম্পন-সংখ্যা একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই কম্পন-সংখ্যা ১ থেকে ১০০০০ মেগাসাইকেল পর্যন্ত বিস্তৃত।

এখানে মেগাসাইকেল কাকে বলে একটু বিস্তারিতভাবে বলা যাক।

১ মেগাসাইকেল ১০ লক্ষ সাইকেলের সমান। যখন ঢেউ ওঠে, সে ঢেউ যেখানেই হোক, তখন সেই ঢেউয়ের উপর আর নীচের অংশ নিয়ে হয় একটি সাইকেল।

অন্য কোনো তারকাকেন্দ্রিক গ্রহের বুদ্ধিমান এবং প্রযুক্তি-জ্ঞানসম্পন্ন সভ্যতা যদি বেতার-সঙ্কেত প্রেরণ করে, তাহলে সে সঙ্কেত অনুসন্ধানের সময়ে নিশ্চয় মনে হবে, এই সভ্যতা কত প্রাচীন! এ কী পার্থিব সভ্যতার সমকালে, পাশাপাশি গড়ে ওঠা আর একটি সভ্যতা? না কী, এ সভ্যতার সূচনা পার্থিব সভ্যতার চেয়ে অনেক প্রাচীনকালে, যার পরিচয় মানব ইতিহাসে কোথাও সামান্য মাত্রাতেও পাওয়া সম্ভব নয়। যদি সত্যিই এমন হয়, এই সভ্যতা মানব ইতিহাসের চেয়ে অনেক পুরোনো, তাহলে এমন একটা ভাবনাকে কিছুতেই সরিয়ে রাখা চলে না যে, এরা আমাদের চেয়ে রীতিমত উন্নত, অধিক সৃষ্টিশীল, বিশেষ কল্পনাময় এক সভ্যতা।

বহির্জাগতিক বিভিন্ন সভ্যতার ক্ষেত্রে একটি শ্রেণীবিভাগও করা চলে। কিসের ভিত্তিতে এই শ্রেণীবিভাগ? শ্রেণীর একটি বিন্যাস করা যায় শক্তিকে অবলম্বন করে—যে শক্তিকে সে উৎপন্ন বা নিয়ন্ত্রণ করে, সেই শক্তি। আমাদের পৃথিবী যে শক্তি উৎপাদন করে, পরিমাণে তা প্রায় ৬০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ওয়াট। শক্তির উৎপাদনে

আমাদের পৃথিবীকে যদি প্রথম পর্যায়ের সভ্যতা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, তাহলে পরবর্তী উন্নততর অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্যায়ের সভ্যতা হিসেবে কাকে ধরব ? দ্বিতীয় পর্যায়ের সভ্যতা হিসেবে সেই সব সভ্যতাকে আমরা গ্রহণ করব, যারা আমাদের সূর্যের অনুরূপ শক্তি উৎপাদন করবে। সে শক্তির পরিমাণ প্রায় ১০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০-০০০ ০০০ ০০০ ওয়াট। এর পরে সর্বাধুনিক এবং প্রাচীনতম সভ্যতার কথা। এই সভ্যতা তৃতীয় পর্যায়ের। এই সভ্যতা যে শক্তি উৎপন্ন করতে পারে, তা বিস্ময়কর। হয়তো তা একটি সমগ্র নক্ষত্রলোকে উৎপন্ন শক্তির সমান, পরিমাণে যা ১০,০০০ ০০০ ০০০-০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ওয়াট। কে করতে পারে সে সভ্যতার পরিমাপ ?

এই জাতীয় অত্যধিক উন্নত সভ্যতা কি আমাদের সঙ্গে যোগা-যোগে আগ্রহী হবে ? যদি এরা আমাদের আলোচনার অযোগ্য এবং সম্পর্ক স্থাপনের অনুপযুক্ত বলে মনে করে ! এ কথা তো সত্যি যে, মর্ত্যলোকে যত বিপুল সংখ্যক ব্যাকটেরিয়া ছড়িয়ে আছে, আমরা তাদের সঙ্গে আলোচনার সূত্রপাতে সামান্যমাত্র উদ্‌গ্রীব এবং উদ্যোগী নই।

তবু এই রকম উন্নত কোনো সভ্যতা যদি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে আগ্রহী হয়, সৌরজগৎ সম্পর্কে কৌতুহলী হয়ে ওঠে ! তাহলে, কি জাতীয় অর্থবহ সঙ্কেত তারা আমাদের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করবে ? যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে প্রত্যেক সভ্যতাই এমন একটি সঙ্কেতধারার কথা নিশ্চয় চিন্তা করবেন যার মধ্যে বৈজ্ঞানিক ব্যুৎপত্তির অবশ্যই কিছুটা পরিচয় থাকে। ককোনি এবং মরিসন বলেছেন, প্রতি সেকেণ্ডে ১ এই হিসেবে ব্রহ্মাণ্ডের অন্য কোনো সভ্যতা আমাদের পৃথিবীর উদ্দেশ্যে তরঙ্গ পাঠাতে পারে, যে তরঙ্গের মধ্যে আমরা বৈজ্ঞানিক এবং মৌলিক চিন্তার খানিকটা আভাস পাব।

বুদ্ধিমান জীবের অনুসন্ধানে সূর্যের অনুরূপ আয়ুষ্কাল এবং জীবনযুক্ত তারকাগুলি বিশেষ সম্ভাবনাময়। ১৫ আলোকবর্ষ দূরত্বের

মধ্যে এ রকম তারকার সংখ্যা কত ? বিজ্ঞানীরা বলছেন, এ রকম সাতটি তারকা রয়েছে, যা সূর্যের অনুরূপ। যদি ঐ সব তারকাকে কেন্দ্র করে কোনো গ্রহজগৎ থাকে এবং সেই গ্রহজগৎ যদি বুদ্ধিমান জীব অধ্যুষিত হয়, তাহলেও এই কাছের তারকাদের সঙ্গে যোগাযোগের সময়কাল খুব সংক্ষিপ্ত নয়। ১৫ আলোকবর্ষ দূরের কোনো গ্রহজগতে বেতার-সঙ্কেতে সংবাদ প্রেরণেই সময় লাগবে প্রায় ১৫ বর্ষ এবং বার্তা-বিনিময়ের ক্ষেত্রে সে সময় এর দ্বিগুণ অর্থাৎ প্রায় ৩০ বর্ষের মতন।

তাহলে একবার সংবাদ বিনিময়ের সময়কালই যখন এত দীর্ঘ, তখন প্রেরিত সংবাদ স্বভাবতই সংক্ষিপ্ত হওয়ার কথা নয়। বরং সকল প্রয়োজনীয় তথ্য গ্রথিত করে যে সংবাদটি প্রেরিত হবে বুদ্ধিমান জীব বসবাসকারী এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে, আপনার পরিচয়, বক্তব্য এবং অভিপ্রায় ব্যক্ত করে তা হবে অত্যধিক দীর্ঘ। হয়তো সেই সংবাদ প্রেরণে একটি সম্পূর্ণ বছর লেগে যেতে পারে। বেতারে অনুষ্ঠান চলা কালে মাঝে মাঝে যেমন বলা হয়, আকাশবাণী, কলকাতা, তেমনই এই সুদীর্ঘ সংবাদ প্রচারের মধ্যে পরিচয়জ্ঞাপক সঙ্কেত থাকতে পারে এবং সেই সঙ্গে ভাষা সংক্রান্ত কিছু পাঠ। গ্রাহক যন্ত্রের সামনে বসে যে সব বিশেষজ্ঞ এই সংবাদ গ্রহণ করবেন, তাঁরা কি সহজেই এর মর্মোদ্ধার করতে সক্ষম হবেন ? মনে হয় না। হয়তো এ সংবাদের সকল অর্থ অনুধাবনে কয়েক বৎসর লেগে যেতে পারে।

যদি এই দীর্ঘ সংবাদ প্রেরণের ক্ষেত্রে একটি সংবাদ নির্ঘণ্ট তৈরী করা যায় তো, সে নির্ঘণ্ট কেমন হবে ?

প্রারম্ভিক সঙ্কেত—১ মিনিট
ভাষা পাঠ —১০ মিনিট
তথ্য প্রেরণ —৫০ মিনিট

সময়ের এই আবর্তে সংবাদ প্রেরিত হবে।

গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমের মত এই বার্তা-সঙ্কেত

নিশ্চয় দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন তারকার দিকে প্রেরিত হবে ; অনতি-বিলম্বে কোনো গ্রহের সঙ্গে আকস্মিকভাবে যোগাযোগ স্থাপিত হবে, এমন চিন্তা স্বাভাবিক নয়।

যদি আমাদের পৃথিবীর দিকে ফিরে তাকাই, তাহলে দেখতে পাব যে, এই পৃথিবীর বুকে যে শক্তিশালী বেতার প্রেরক-যন্ত্র আছে, সেই সব প্রেরক-যন্ত্রের সাহায্যে আমরা ১০ আলোকবর্ষ দূরের কোনো সৌরজগতেও সঙ্কেত প্রেরণ করতে পারি। অবশ্য সেই সঙ্কেত গ্রহণ করবার জন্যে গ্রাহক-কেন্দ্রেও চাই অনুরূপ বেতার-যন্ত্র।

কিন্তু দূরত্ব যদি ০ আলোকবর্ষকে অতিক্রম করে! বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, ১৫ আলোকবর্ষ দূরত্বের মধ্যে সম্ভাবনাময় সাতটি তারা আছে। ৫০ আলোকবর্ষ দূরত্বের মধ্যে এ রকম তারকার সংখ্যা ১০০। ১৫ আলোকবর্ষ দূরত্বের মধ্যে যে সাতটি তারকার কথা বিজ্ঞানীরা বলছেন, তারা হল সেন্টরাস মণ্ডলের আলফা তারকা (Alpha Centauri), অফিয়াকাস মণ্ডলের ৭০ সংখ্যক তারকা (70 Ophiuchi), সিগন্যাস মণ্ডলের ৬১ সংখ্যক তারকা (61 Cygni), সিটাস মণ্ডলের টাউ তারকা (Tau Ceti), এরিডেনাস মণ্ডলের 'ও-২' এবং এপসাইলন তারকা (O_2 and Epsilon Eridani) এবং ইনডাস মণ্ডলের এপসাইলন তারকা (Epsilon Indi)। জীবনের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে এদের সবগুলিকেই বিজ্ঞানীরা অবশ্য গ্রহণ করেন নি।

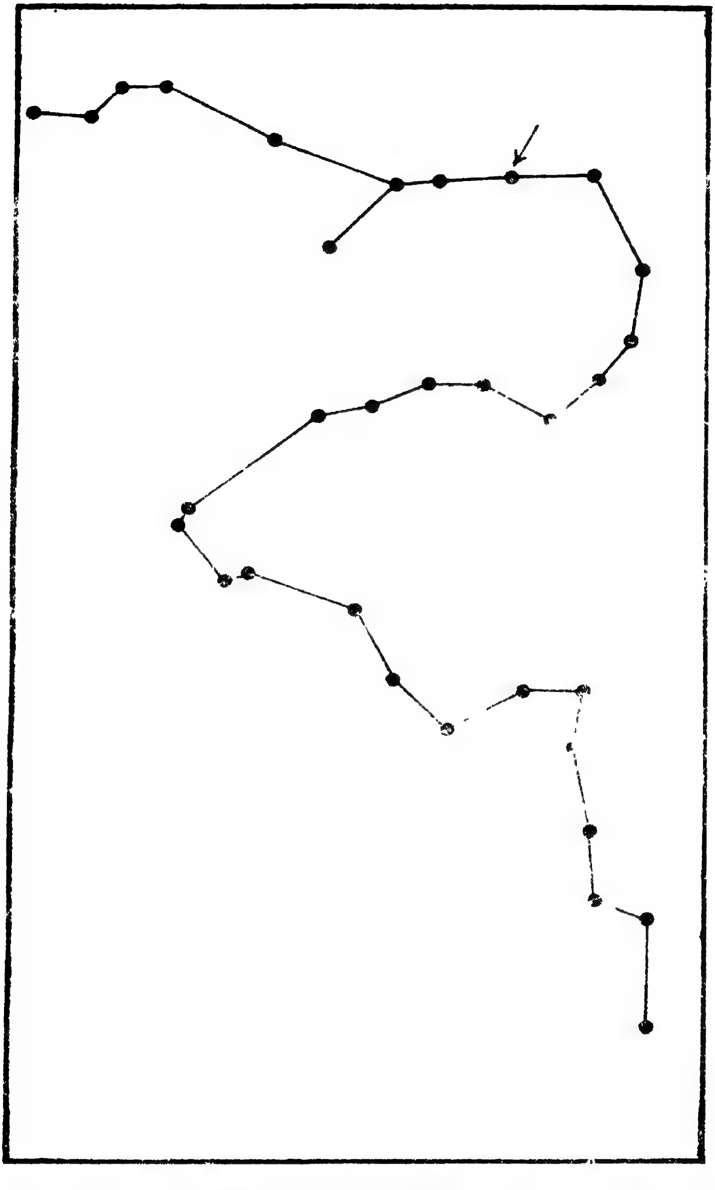

এরিডেনাস মণ্ডলের এপসাইলন তারকা (তীর চিহ্নিত)। এই তারকাটিকে কেন্দ্র করে কোনো সভ্য গ্রহজগৎ কি গড়ে উঠেছে, যেখান থেকে বেতার-সঙ্কেত আসতে পারে আমাদের এই মর্ত্যলোকের উদ্দেশ্যে ?

অষ্টম অধ্যায়

বহির্জাগতিক কোনো সভ্যতা কি অন্য গ্রহবাসী এক সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগের উদ্দেশ্যে সত্য সত্যই কোনো সঙ্কেত প্রেরণ করে চলেছে? তত্ত্বগত দিক দিয়ে এ খুবই সম্ভব। খুব আশাবাদী যাঁরা, তাঁরা বলছেন, হয়তো প্রতি চারটি তারকার একটিতে এমন গ্রহ আছে, যেখানে গড়ে ওঠা সভ্যতা যোগাযোগের উদ্দেশ্যে, সঙ্কেত প্রেরণ করে চলেছে। আর যাঁরা একেবারেই আশাবাদী নন, তাঁদের অভিমত, যদি সেরকম উন্নত সভ্যতার বিকাশ ঘটে থাকে কোথাও, তাহলে তা গড়ে উঠেছে দশ লক্ষ থেকে ত্রিশ লক্ষ তারকার মাত্র একটিকে কেন্দ্র করে, তার বেশি নয়। বাস্তবের কথা কে বলবে? কিন্তু সত্য লুকিয়ে আছে সম্ভবত এই দুই চূড়ান্ত ধারণার মধ্যবর্তী কোনো পরিসংখ্যানে।

আমাদের সৌরজগতের অন্য কোনো গ্রহে বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব না থাকলেও, বিজ্ঞানীরা ১৫ আলোকবর্ষ দূরত্বের মধ্যে সম্ভাবনাময় যে ক'টি তারকাকে কেন্দ্র করে বুদ্ধিমান জীবযুক্ত গ্রহ থাকতে পারে বলে অনুমান করেন, সেগুলি থেকে কি কোনো সঙ্কেত আসতে পারে?

যদি আমাদের বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞানের কথা ধরি তাহলে সে সম্পর্কে বলা যায় যে, এর সূচনা দীর্ঘকালের নয়। মাত্র ৫০ বছর পূর্বে যে বিষয়টির অঙ্কুরোদ্গম বলা চলতে পারে, আজ সে কোথায় এসে পৌঁচেছে? আরও ৫০ বছর বাদে, সামান্য ১০০ বছর সময়-সীমার মধ্যে প্রাথমিক অবস্থা থেকে এই বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞান কোন্ চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছোবে? মাত্র এক শতাব্দীকাল—কিন্তু বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞানের জগতে চরমতম সমৃদ্ধি। ব্রহ্মাণ্ডে যে

সব সভ্য, উন্নত গ্রহজগতের কথা আমরা মর্ত্যবাসীরা চিন্তা করি, সেই সব গ্রহে কি বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়টি বিকাশ লাভ করেছে? এমন হতে পারে সেই গ্রহবাসীরা বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত, সেখানে এ সম্পর্কে কোনো ধারণার অঙ্কুরোদ্গম হয়নি। আবার এমনও হওয়া সম্ভব যে, বেতার দূরবীক্ষণ বিষয়টি সম্পর্কে সেই বুদ্ধিমান গ্রহবাসীরা সচেতন। কিন্তু একটা কথা মানতেই হবে যে, ওই দূর নক্ষত্রলোকের কোনো গ্রহের বিজ্ঞানীদের কাছে যদি বিষয়টি অপরিচিত না হয়, তাহলে পার্থিব বিকাশের চিত্র অনুসারে সেখানে নিশ্চয় এটির বিকাশ ঘটেছে চূড়ান্ত পর্যায়ে।

অন্য কোনো সভ্যতা থেকে বেতারবার্তা প্রেরিত হচ্ছে এমনটি ধরে নিয়ে সেই সঙ্কেতকে গ্রহণ করবার প্রথম প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে। কল্পলোকের এক অচিন্ রাজ্য ওজ—তার রাজকন্যা ওজমা, সেই রাজকন্যার নাম অনুসারে প্রকল্পটির নামকরণ হল ওজমা প্রকল্প। এটির উদ্যোক্তা ফ্রাঙ্ক ড্রেক। সময় ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দ। সম্ভাবনাময় যে দুটি তারকাকে তিনি স্থির করেন, তারা হল টাউ সেটি এবং এপসাইলন এরিদানি। এই দুটি তারকাই সূর্যের মত, আমাদের থেকে যথাক্রমে ১২ এবং ১১ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত।

বহির্জাগতিক এই দুটি সম্ভাবনাময় তারকা থেকে কোনো অর্থবহ সঙ্কেত কি প্রেরিত হচ্ছে অন্য কোনো সভ্যতার উদ্দেশ্যে? এই প্রশ্নটি বারম্বার আলোড়িত করে চলল চিন্তার পরিমণ্ডলকে। সদুত্তরের আশায় ড্রেক এবং তাঁর সহকর্মীরা পশ্চিম ভারজিনিয়ার গ্রীণ ব্যাঙ্কে অবস্থিত ন্যাশনাল রেডিও অ্যাস্ট্রনমি অবসারভেটরির ৮৫ ফুট বা ২৬ মিটার ব্যাসযুক্ত বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি কাজে লাগান। অর্থবহ বেতার-সঙ্কেত যদি ধরা পড়ে, যদি কোনো সঙ্কেতের হদিশ পাওয়া যায়, তাহলে সমগ্র মানবসভ্যতার ইতিহাসে, না শুধু মানবসভ্যতার নয়, সমগ্র সৃষ্টির পরিমণ্ডলে এক নব দিগন্তের সূচনা হবে।

আর যদি না হয়, সে রকম সম্ভাবনাই শতকরা একশো ভাগ, তাহলেও নিরাশ হওয়ার মত কোনো কারণ নেই।

যদি অনুসন্ধান বিঘ্নিত না হয়, যদি প্রযুক্তিগত কৌশলে প্রকল্পটি আধুনিক হয়ে ওঠে, তাহলে ভবিষ্যতে একদিন যোগাযোগ স্থাপিত হবেই বলে বিজ্ঞানীরা ভরসা রাখেন। নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা, উন্নত কারিগরিবিদ্যা, আন্তরিক নিষ্ঠা এবং তত্ত্বগত সঠিক ধারণা যে সকল সাফল্যের মূলমন্ত্র তাতে আর সন্দেহ কি?

তবু ড্রেক এবং তাঁর সহকর্মীরা জনসমক্ষে তাঁদের এই বিচিত্র পরিকল্পনার কথা প্রথমে ব্যক্ত করেন নি। কিন্তু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ২১ সেন্টিমিটার বেতার-তরঙ্গে বুদ্ধিমান জীব প্রেরিত সঙ্কেতের অনুসন্ধান করা যায় বলে যখন অন্যান্য বিজ্ঞানীরা মন্তব্য করেন, তখনই ড্রেক এবং তাঁর সহযোগীরা তাঁদের উদ্যোগের কথা প্রকাশ করবার মত একটা অনুকূল অবস্থায় আসেন।

কিন্তু বিজ্ঞানীসমাজে সবাই কি তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন? না, তা নয়।

জনসমক্ষে ড্রেকের পরিকল্পনাটি প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার পরে বিমিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেল। বিজ্ঞানীসমাজ দ্বিধাবিভক্ত হলেন। একদিকে উৎসাহ, অন্যদিকে ধিক্কার। একদল বিজ্ঞানী এই প্রচেষ্টাকে এক মহত্তম উদ্যোগ হিসেবে সূচিত করলেন, অন্য দল বললেন, না, তা নয়, এ কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র। বেতার জ্যোতি-র্বিজ্ঞানে এ এক অপকীর্তির সমতুল।

একদিকে উৎসাহ এবং অন্যদিকে নৈরাশ্য—এরই মধ্যে পরিকল্পনা মত কাজ এগিয়ে চলল।

সিটাস মণ্ডলের টাউ এবং এরিডেনাস মণ্ডলের এপসাইলন তারকা থেকে ২১ সেন্টিমিটার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ আসছে কিনা অনুসন্ধানের সময়ে ফ্রাঙ্ক ড্রেককে পশ্চিম ভারজিনিয়ার গ্রীণ ব্যাঙ্কের বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রটির দিকে তাকিয়ে কয়েকটি কথা ভাবতে হয়েছিল।

তারকা দুটির দূরত্ব ১১ বা ১২ আলোকবর্ষের মত। এই দুটি তারকা থেকে যদি সত্যিই কোনো অর্থবহ সঙ্কেত পাঠানো হয়ে

থাকে তাহলে আলোর গতিতে ছুটেও পৃথিবীর বুকে এসে পৌঁছোতে তার সময় লাগবে ওই ১১ বা ১২ বছরের মত। কিন্তু এই দীর্ঘপথ অতিক্রমের ক্লান্তি আছে। তাছাড়া পথিমধ্যে আছে অনেক অবাঞ্ছিত তরঙ্গের ভীড়। অবসন্নতায় এবং বিশৃঙ্খল তরঙ্গের সমাবেশে সে হারিয়ে যাবে না তো!

এই আশঙ্কায় ড্রেক বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন।

যদি কোনো তারকাকেন্দ্রিক কোনো গ্রহ থেকে সঙ্কেত আসে তাহলে সেই সঙ্কেত যাতে না হারিয়ে যায়, তাকে আলাদাভাবে, স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করার জন্যে ড্রেক ৮৫ ফুট ব্যাসযুক্ত রেডিও-দূরবীনটির কেন্দ্রে দুটি গ্রাহক হর্ণের ব্যবস্থা করেন। একটি হর্ণ নির্দিষ্ট তারকা থেকে উদ্দিষ্ট সঙ্কেত গ্রহণের জন্যে ব্যবহৃত হবে। দ্বিতীয় হর্ণটির মুখ থাকবে অন্যদিকে, আকাশের যত অবাঞ্ছিত শব্দ এসে ধরা পড়বে ওর মধ্যে।

কিন্তু যে অভীপ্সিত সঙ্কেতটির জন্যে এই অভিযান, পথশ্রান্ত সেই দুর্বল সঙ্কেতটি ধরা পড়বে তো? আশঙ্কা যে ছিল না, তা নয়। ফলে সেটিকে পরিবর্ধনের কথাও ফ্রাঙ্ক ড্রেক চিন্তা করেন এবং তদনুযায়ী একটি ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়।

অবশেষে কাজ শুরু হল ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে, এপ্রিল মাসের ৮ তারিখে, ভোর প্রায় ৪টায়। সম্ভাবনা যদিও অকিঞ্চিৎকর, প্রায় নেই বললেই চলে, তবুও প্রথম তারকাটিকে লক্ষ্য করবার সময়ে উত্তেজনায় সকলের বুক কেঁপেছিল নিশ্চয়। বেতার দূরবীক্ষণকে সেটাস মণ্ডলের টাউ তারকাটির দিকে নিবদ্ধ করা হল। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের পর্বতশিখর অতিক্রম করে তারকাটি তখন আকাশপটে সবে দেখা দিয়েছে। আশাবাদী ড্রেক এবং তাঁর সকল সহযোগী অচঞ্চল ধৈর্যে মানব ইতিহাসের সর্বকালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলেন। যদি কোনো বেতার-সঙ্কেত ধরা পড়ে! না, সচকিত হয়ে ওঠার মত কিছু নয়, মনোযোগ আকর্ষণ করার মত কোনো কিছুই নজরে এল না। অপরাহ্ণে তারাটি পশ্চিম আকাশে

অস্তগামী, তখন সে দৃষ্টির অন্তরালে, দিনের আলোর গভীরে। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তারকাটিকে স্থির দৃষ্টিতে অনুসরণ করে চলেছেন। সেই মহত্তম, সেই সর্বোত্তম সঙ্কেতটির আশায়। কিন্তু না, কেহ নাই, কিছু নাই। পূর্ব আকাশে উদয়ের সময়কাল থেকে অস্তগমনের সময় পর্যন্ত কোনো অস্বাভাবিকতা একবারও পরিলক্ষিত হল না।

প্রথম তারকাটির এই ফলাফল কখনোই অপ্রত্যাশিত ছিল না। তবুও আশায় আশায় বিজ্ঞানীরা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন, যদি কিছু পাওয়া যায়, যদি কিছু ধরা পড়ে।

ফলে আশার আলোয় তাঁরা দ্বিতীয় লক্ষ্য বস্তুটির দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। এই দ্বিতীয় লক্ষ্য বস্তু এরিডেনাস মণ্ডলের এপসাইলন তারকা। কিন্তু না, সেটিতেও উৎসাহিত হওয়ার মত কোনো সঙ্কেত ধরা পড়েনি। টাউ সেটি এবং এপসাইলন এরিডানি তারকা দুটি ছাড়া ফ্রাঙ্ক ড্রেক আরও দুটি তারকার কথা চিন্তা করেন, এর একটি ইনডাস মণ্ডলের এপসাইলন তারকা, অন্যটি ড্রাকো মণ্ডলের সিগমা। ইনডাস মণ্ডলের এপসাইলন ১৫ আলোকবর্ষ দূরত্বের মধ্যবর্তী তারকা। কিন্তু ড্রাকো মণ্ডলের সিগমা তা নয়। সে সূর্যের মতই কিন্তু অন্যান্য তারকার চেয়ে অনেক দূরবর্তী। আর ইনডাস মণ্ডলের এপসাইলন তারকার অবস্থান আকাশের অনেক দক্ষিণে, গ্রীণ ব্যাঙ্কের অনুভূমি থেকে তাকে দেখা যায় না।

১৯৬০ খ্রীস্টাব্দের মে এবং জুন মাসে প্রায় ১৫০ ঘণ্টা ধরে বিজ্ঞানীরা এপসাইলন এরিডানি এবং টাউ সেটি তারকা দুটি থেকে ২১ সেন্টিমিটার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের কোনো বেতার-সঙ্কেত আসছে কিনা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। কিন্তু উত্তেজিত বা উৎসাহিত হওয়ার মত কোনো কিছুই আর ঘটেনি। সুতরাং ওজমা প্রকল্পের পরিসমাপ্তি। কিন্তু ড্রেকের অভিমত, এ পরিসমাপ্তি নয়, এ এক অনুচ্ছেদ বা সাময়িক বিরতি মাত্র। যদি নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে ভবিষ্যতে একদিন সাফল্য আসবেই। সে সাফল্য আসতে কত সময় লাগবে, তার উত্তর দেবে কে?

নবম অধ্যায়

ওজমা প্রকল্প ব্যর্থ হল. না, ব্যর্থ হল বলা ঠিক নয়. বরং বলা যায় সাময়িক অসাফল্যে প্রকল্পটি অনির্দিষ্টকালের জন্যে স্থগিত রইল। ব্রহ্মাণ্ডে অন্যত্র বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা এবং অনুসন্ধানের পদ্ধতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা বন্ধ হল না। ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বরে গ্রীণ ব্যাঙ্ক সম্মিলনের পরে ওজমা প্রকল্পের মূল উদ্যোক্তা ফ্রাঙ্ক ড্রেক সম্মিলনে যোগদানকারী সকল সদস্যের নিকটে একটি বার্তা প্রেরণ করেন। বার্তাটির দিকে তাকালে আপাতদৃষ্টিতে সে অর্থশূন্য মনে হয়, কিন্তু ড্রেক এবং তাঁর অনুগামীদের ধারণা, যে ২১ সেন্টিমিটার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে বেতার-সঙ্কেতের জন্যে তাঁরা ওজমা প্রকল্পের কথা চিন্তা করেছিলেন, সেই প্রকল্পে যদি কোনো সঙ্কেত ধরা পড়ত, তাহলে সেই অর্থবহ সঙ্কেত হত সম্ভবত তাঁদের পরিকল্পিত ওই রকম এক পর্যায়ের।

মর্ত্যলোকের যে কোনো ভাষাই বহির্বিশ্বে অচল। আন্তর্জাতিক কোনো ভাষাই আন্তর্জাগতিক নয়। ফলে মর্ত্যলোকের সকল ভাষাই যেমন ব্রহ্মাণ্ডের অন্যত্র অবোধ্য, তেমনি ব্রহ্মাণ্ডের অন্য কোনো গ্রহ থেকে যদি কোনো অর্থবহ সঙ্কেত আমাদের পৃথিবীতে ধরা পড়ে তাহলে তার অর্থোদ্ধার করাও খুব সহজ না হতে পারে।

দুটি ভিন্ন গ্রহে যোগাযোগকারী সভ্যতা নিশ্চয় এই সমস্যাটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। তাহলে যোগাযোগকারী প্রতিটি সভ্যতা কি ধরনের সঙ্কেত অবলম্বন করবেন? চিন্তা-ভাবনায় ধ্যান-ধারণায় ভিন্ন, দুটি হয়তো একেবারে স্বতন্ত্র সভ্যতা কি সাঙ্কেতিক ভাষালিপিতে পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময় করবে?

সমস্যাটি সামান্য নয়। কিন্তু এর কোনো বৈজ্ঞানিক সমাধান কি সম্ভব? যে সব বিজ্ঞানী মহাজাগতিক ভাষার কথা চিন্তা-ভাবনা করেন, তাঁরা একথা বুঝেছিলেন যে, ভাষা যেখানে অবোধ্য, সেখানে চিত্ররূপ অবলম্বনে যোগাযোগ এবং বার্তাবিনিময় প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু চিত্ররূপের সঙ্কেত কি ভাবে সম্ভব? ড্রেক এই দিকটিতে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। স্বভাবতই ড্রেক যে বার্তাটির পরিকল্পনা করেন,

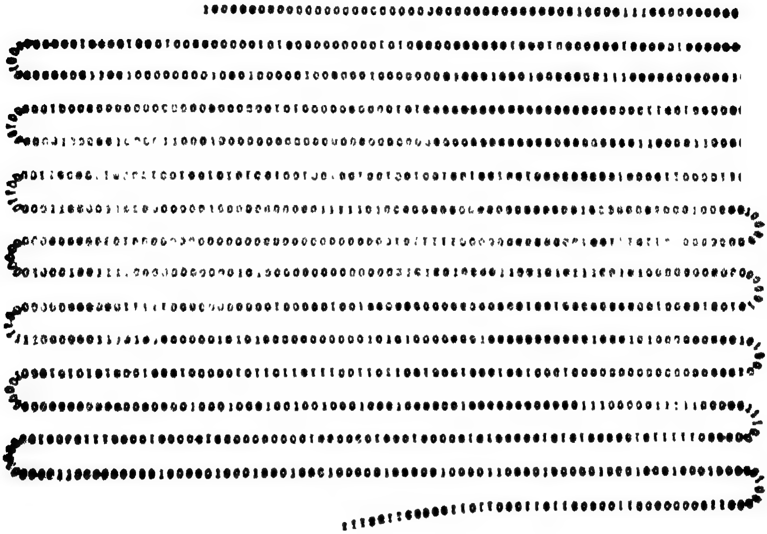

তাতে কোনো ভাষা নেই, থাকার কথাও নয়। ড্রেকের অর্থবহ বা চিত্রবহ সাঙ্কেতিক বার্তা কতকগুলি স্পন্দনযুক্ত, একটি নির্দিষ্ট হারে যাদের প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ দুটি স্পন্দন এবং অন্তর্বর্তী একটি ব্যবধান বা বিরতি।

ড্রেক স্পন্দনগুলিকে নির্দেশ করলেন ১—এই সংখ্যাটি দিয়ে এবং ব্যবধানকে শূন্য দিয়ে অর্থাৎ সংখ্যা মাত্র দুই—০ ও ১। এবং মাত্র এই ০ এবং ১ দিয়ে আপন পরিচয়-জ্ঞাপন এবং যোগাযোগের ব্যবস্থা নিশ্চয় যোগাযোগের সরলতম প্রক্রিয়া।

ড্রেকের এই বার্তাটিতে ০ এবং ১-এর সর্বমোট সংখ্যা ১২৭১।

গণিতে যাঁর সামান্য ব্যুৎপত্তি আছে তিনি সহজেই বুঝতে পারবেন ১২৭১ দুটি মৌলিক সংখ্যার গুণফল। এই দুটি মৌলিক সংখ্যা ৩১ এবং ৪১। ৩১ এবং ৪১ মৌলিক সংখ্যা দুটির ভেতর একটা ইঙ্গিত আছে। বার্তাটি হয় ৩১ লাইনের, নয় তো বার্তাটিতে আছে ৪১

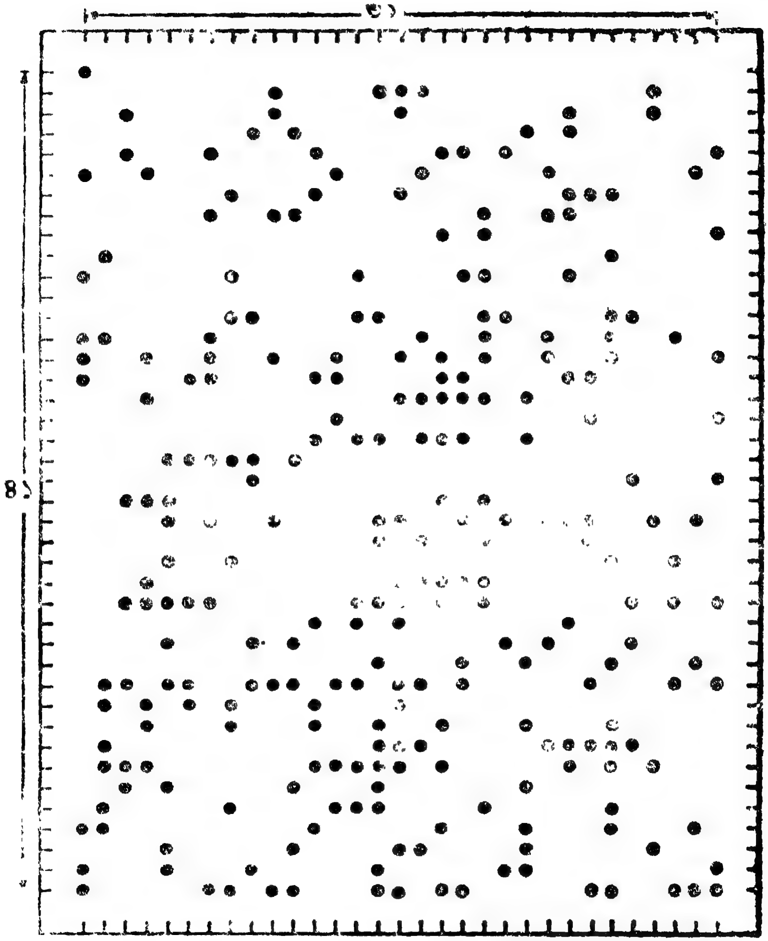

লাইন। যদি বার্তাটিতে ৩১ লাইন থাকে, তাহলে প্রতি লাইনে ০ এবং ১ এর সংখ্যা ৪১। যদি আবার লাইনের সংখ্যা হয় ৪১, ০ এবং ১ এর সর্বমোট সংখ্যা তখন প্রতি লাইনে হবে ৩১।

এই লিখিত বার্তার ভেতর থেকেই চিত্ররূপটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে কী ভাবে ?

গ্রীণ ব্যাঙ্কের সকল সদস্যের কাছে ড্রেক বার্তাটি প্রেরণ করলেও সকলেই এটির সমাধান করতে পারেন নি। বার্তাটির প্রকার-প্রকরণ এরকম এবং এটি এত সংক্ষেপিত যে, এটির মর্মোদ্ধার করা সহজ ছিল না। তবু বারনারড অলিভার নামে একজন সদস্য এটিকে বিশ্লেষণ করতে পেরেছিলেন :

বার্তাটিকে সাঙ্কেতিক রূপ থেকে উদ্ধার করবার সময়ে '১' কে ধরা হল একটি বিন্দু হিসেবে এবং '০' এর স্থানে ফাঁক দেওয়া হল। চিত্ররূপে কী পাওয়া গেল ? দুটি চিত্ররূপ—একটি ৪১ লাইনের, অন্যটি ৩১ লাইনের। ৪১ লাইনের চিত্ররূপটি অর্থবহ নয়। কিন্তু ৩১ লাইনের চিত্ররূপটি টেলিভিশনের পর্দায় ভেসে ওঠা একটা ছবি যেন। এই সংক্ষেপিত ছবিটির মধ্যে অনেকগুলি বিষয়ের উল্লেখ আছে :

চিত্রের বাঁ দিকের শীর্ষে বর্গাকার যে ক্ষেত্রটি নজরে আসে, ওটি যে সভ্য জগৎ থেকে বার্তা আসছে সেই সৌরজগতের সূর্যের নির্দেশ দিচ্ছে। গ্রহগুলি আছে নীচ বরাবর। গ্রহগুলির দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, মানুষের অনুরূপ এক সভ্য জীব এই চতুর্থ গ্রহটির সঙ্গে যুক্ত অর্থাৎ ওই সূর্য থেকে দূরত্বের দিক দিয়ে চতুর্থ গ্রহটিতে মানবসভ্যতার মতনই আর এক সভ্যতার বাস। তৃতীয় গ্রহটি থেকে তরঙ্গায়িত রেখা চলে গিয়েছে অন্য প্রান্ত বরাবর। ওই তরঙ্গায়িত রেখা কিসের ইঙ্গিত বহন করে ? অনুমান করা অসঙ্গত নয়, তরঙ্গায়িত রেখা জলের নির্দেশ করছে। তাহলে হয়তো নির্দিষ্ট গ্রহটি জলময়। তরঙ্গের তলভাগে মাছের অনুরূপ একটি রেখাঙ্কন নজরে আসে। ওই রেখাঙ্কন থেকে এমন একটা ধারণা করা যায় যে, চতুর্থ গ্রহের প্রাণীরা তৃতীয় গ্রহটির পরিক্রমা সম্পূর্ণ করেছে এবং এই গ্রহটিতে জলজ জীবনের সন্ধান তাঁরা পেয়েছেন। চিত্রটির একেবারে বাম প্রান্তে উপর থেকে নীচে গ্রহগুলির সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। এই উল্লেখ

'০' এবং '১' অর্থাৎ বাইনারি সঙ্কেত অবলম্বনে। এই সঙ্কেতমালায়

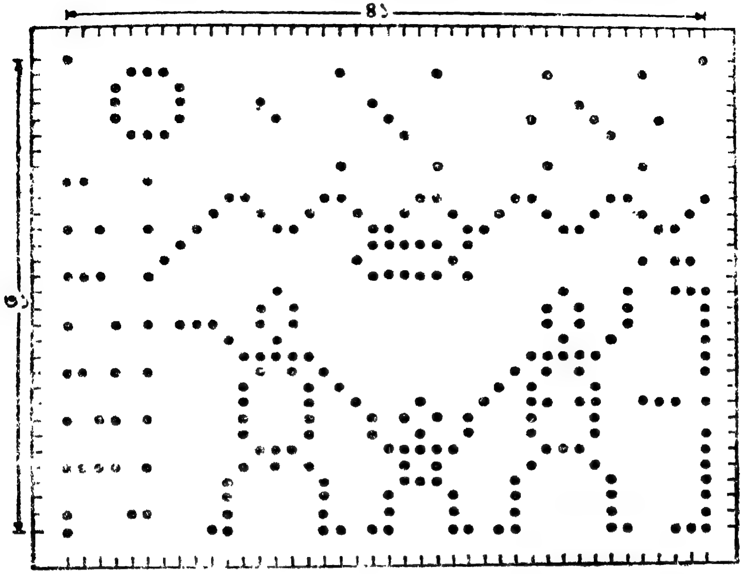

১ থেকে ১৫ পর্যন্ত আমাদের অঙ্ক নিম্নলিখিতভাবে ব্যক্ত করা হয় ঃ

১=১	৯=১০০১
২=১০	১০=১০১০
৩=১১	১১=১০১১
৪=১০০	১২=১১০০
৫=১০১	১৩=১১০১
৬=১১০	১৪=১১১০
৭=১১১	১৫=১১১১
৮=১০০০	

চতুর্থ গ্রহটিতে বার্তা-প্রেরক যে বুদ্ধিমান সভ্যতার বসবাস, সেই সভ্যতার একটি পুরুষ, স্ত্রী এবং একটি সন্তানের অর্থাৎ একটি সম্পূর্ণ পরিবারের চিত্র আছে বার্তা-সঙ্কেতটির মধ্যে। গ্রহটির নিকটে পুরুষ. তার একটি হাত গ্রহটিতে। অন্য হাতটি সন্তানের হস্তধৃত। সন্তানের দ্বিতীয় হস্ত মায়ের প্রসারিত হস্তে।

চতুর্থ গ্রহের এই যে সভ্য জীব, এই জীবের উচ্চতা কত? চিত্রের একেবারে ডান পার্শ্বে একটি স্কেল উন্নত জীবটির উচ্চতা নির্দেশ করছে। এরই উর্দ্ধে বাইনারি সঙ্কেতে ১০১১ অর্থাৎ আমাদের পরিচিত ধারনায় ১১ একক। একটি এককের দৈর্ঘ্য কত? যদি ২১ সেন্টিমিটার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এই সঙ্কেতের বাহক হয়ে থাকে, তাহলে খুবই স্বাভাবিক যে, এই ২১ সেন্টিমিটার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যই একক হিসেবে নির্দিষ্ট থাকবে। অর্থাৎ ওই প্রাণীরা উচ্চতায় সাড়ে ৭ ফুটের মতন হবে। নিঃসন্দেহে আমাদের গড় উচ্চতার চেয়ে এই সভ্য জীব উচ্চতায় যথেষ্ট বেশি।

বার্তা-সঙ্কেতের চিত্ররূপে এত তথ্যের উল্লেখের সঙ্গে আরও দু একটি বিষয় সন্নিবেশিত আছে। চিত্রের শীর্ষভাগে হাইড্রোজেন, কারবন এবং অক্সিজেন পরমাণুর গঠনের সাঙ্কেতিক নির্দেশ রয়েছে। যে রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ভিতর দিয়ে এই মর্ত্যলোকে জীবনের সৃষ্টি, যদি সত্যিই কোনোদিন এরকম একটি বার্তা-সঙ্কেত এই পৃথিবীতে ধরা পড়ে, তাহলে বোঝা যাবে যে, প্রেরক গ্রহের সভ্যতা মর্ত্যের সভ্যতার মত অনুরূপ রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছিল।

সাধারণ ধাঁধার ক্ষেত্রে যে কৌতুহল সৃষ্টি একমাত্র উদ্দেশ্য ফ্রাঙ্ক ড্রেকের এই সঙ্কেত-বার্তা সেই পর্যায়ের ছিল না। তিনি তাঁর সহযোগীদের কাছে সেই উদ্দেশ্যে এই বার্তাটি প্রেরণ করেন নি। বার্তাপ্রেরণ যে একটি সহজ প্রক্রিয়া নয়, বক্তব্য, বিন্যাস, সর্বোপরি মর্মোদ্ধারের কথা চিন্তা করে ভিন্ন গ্রহবাসী, হয়তো ভিন্ন লোকবাসী কোনো সভ্যতার উদ্দেশ্যে একটি সংক্ষিপ্ত বার্তা প্রণয়ন যে অত্যন্ত দুরূহকর্ম, সহযোগীদের সেই কথাটা বোঝানোই ছিল ড্রেকের উদ্দেশ্য।

ড্রেক পরিকল্পিত এই সাঙ্কেতিক-বার্তার অনুরূপ আর একটি সাঙ্কেতিক-বার্তা প্রেরণ করা হয়েছিল হারকিউলিস মণ্ডল যুক্ত একটি তারকাপুঞ্জের উদ্দেশ্যে। পরিকল্পনাকারী ফ্রাঙ্ক ড্রেক এবং কারল

সাগান। ওজমা প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল ভিন্ন—সেখানে সঙ্কেত আহরণ ছিল উদ্দেশ্য, যদি অন্য গ্রহবাসী কোনো সভ্যতা সঙ্কেত প্রেরণ করে! এক্ষেত্রে সঙ্কেত আহরণ নয়, সঙ্কেত প্রেরণই ছিল উদ্দেশ্য, লক্ষ্যাভিমুখী তারাজগতে যদি সঙ্কেত-বার্তা ধরা পড়ে!

সঙ্কেত বার্তাটি প্রেরণ করা হয়েছিল ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে। হারকিউলিস মণ্ডলে যে বিখ্যাত তারাপুঞ্জটি আছে, অ্যারেসিবো মানমন্দিরে (Arecibo Observatory) ১০০০ ফুট ব্যাসযুক্ত বেতার-দূরবীক্ষণ থেকে সেটির দিকে বার্তা প্রেরিত হল।

বার্তাটি কি রকম?

গ্রীণ ব্যাঙ্ক সাম্মলনের সময় '০' এবং '১' নির্ভর ড্রেক যে দ্বিমাত্রিক বার্তা সঙ্কেতটির পরিকল্পনা করেন, হারকিউলিস মণ্ডলের উদ্দেশ্যে প্রেরিত সঙ্কেত-বার্তাটি সেই দ্বিমাত্রা নির্ভর এবং অনেকটা ওই জাতায় বার্তারই অনুরূপ। ফলে বার্তাটির মর্মোদ্ধার কঠিন নয়। এখানে প্রতিটি '১' কে একটি সাদা বর্গ এবং '০' কে একটি কালো বর্গ ধরে ৭ টি লাইনে এবং প্রতিটি লাইনে ২৩টি বৈশিষ্ট্যের সন্নিবেশে বক্তব্যের চিত্ররূপ সহজেই পাওয়া যায়। প্রতিটি লাইনেই বক্তব্যের সূচনা ডান দিক থেকে। বক্তব্যে '০' এবং '১' এর সর্বমোট সংখ্যা ১৬৭৯। যে দুটি উৎপাদকে এই সংখ্যাটিকে বিশ্লিষ্ট করা যায়, সেই দুটি সংখ্যাই মৌলিক।

বার্তার চিত্ররূপে কি কি পাওয়া যায়?

সেখানে দ্বিমাত্রিক সঙ্কেতে ১ থেকে ১০ পর্যন্ত সংখ্যার উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্যের মধ্যে আছে হাইড্রোজেন, কারবন, নাইট্রোজেন, অকসিজেন ও ফসফরাসের পরমাণু সংখ্যা, ডি এন এ-সংক্রান্ত কিছু তথ্য, মানব পরিচয়, সৌরজগতের বর্ণনা এবং অ্যারেসিবো দূরবীক্ষণের ব্যাস।

ডি এন এ ডি অক্সি রিবোনিউক্লিক অ্যাসিডের সংক্ষিপ্ত রূপ। দেহকোষের ক্রোমোজোম বংশবৈশিষ্ট্যের যে পদার্থ বহন করে তার এককের নাম বংশাণু। ডি এন এ বংশাণুর প্রধান রাসায়নিক

উপাদান। এটি অসংখ্য নিউক্লিয়োটাইড দ্বারা গঠিত। চিত্ররূপে ডি এন এ-তে নিউক্লিয়োটাইডের সংখ্যা এবং একটি সূত্র আছে। তা ছাড়া ডি এন এর জোড়া কুণ্ডলটিও দেখানো হয়েছে। ডি এন এর অণুগুলি দুটি রজ্জুর মত অংশ দিয়ে তৈরী এবং ওই দুটি রজ্জু পরস্পরকে জড়িয়ে একটি জোড়া কুণ্ডল (Double Helix) সৃষ্টি করে।

সঙ্কেত-বার্তায় মানব চিত্ররূপটি লক্ষ্য করবার মত। সঙ্গে উচ্চতার নির্দেশ আছে। পৃথিবীতে জনসমষ্টি কত তাও উল্লেখ করা হয়েছে। এর নীচেই সূর্য এবং নবগ্রহের উল্লেখ—পৃথিবীকে সরানো আছে ঈষৎ মানবচিত্রটির দিকে।

সর্বশেষে, যে অ্যারেসিবো দূরবীক্ষণ থেকে সঙ্কেতবার্তাটি প্রেরিত হয়েছে সেই দূরবীক্ষণের চিত্রটি সন্নিবেশিত আছে, সঙ্গে ব্যাসের পরিমাপ।

১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে ন্যাশন্যাল রেডিও অ্যাসট্রোনমি অবসারভেটারিতে বহির্জাগতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ফ্রাঙ্ক ড্রেকের উদ্যোগের পর থেকে অ্যারেসিবো প্রকল্পের পূর্ব পর্যন্ত সোভিয়েট রাশিয়া এবং আমেরিকার বিভিন্ন মানমন্দিরে বিজ্ঞানীরা কয়েকটি নিকটবর্তী তারকা বা নক্ষত্রলোককে লক্ষ্য করেন, উদ্দেশ্য যদি কোনো সভ্যতা গড়ে ওঠে কোথাও, কোনো তারকাকে কেন্দ্র করে। যদি কোনো গ্রহ থেকে সঙ্কেত আসে, এই আশায় বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন বেতার-তরঙ্গে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। কিন্তু না, সে প্রচেষ্টা আজ পর্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠেনি। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে সোভিয়েট রাশিয়ার গোরকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৫ ফুট গোরকি অ্যানটেনাকে এই জাতীয় গবেষণা কার্যে প্রয়োগ করা হয়। সূর্যের অনুরূপ নিকটবর্তী ১২টি তারকা থেকে ২১ এবং ৩০ সেন্টিমিটার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে কোনো সঙ্কেত আসছে কিনা লক্ষ্য করাই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল। উদ্যোক্তা ছিলেন ট্রয়েটস্কি (Troitsky)। অন্তর্বর্তীকালে এই জাতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে আরও কয়েকটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। দেখা যাক, কোথাও যোগাযোগ স্থাপিত হয় কি না।

কিন্তু যদি অন্য গ্রহ থেকে সত্য সত্যই কোনো সঙ্কেত আসে! তাহলে সে সঙ্কেত গ্রহণের বাস্তব উন্নত আর কি পদ্ধতি হতে পারে?

ওজমা প্রকল্পের মত পদ্ধতিতেই সে সঙ্কেত গ্রহণে বিজ্ঞানীরা উদ্যোগী হবেন। কিন্তু বর্তমানে যে সব বেতার-দূরবীক্ষণ সক্রিয় অবস্থায় রয়েছে এর কোনোটিই যথেষ্ট উন্নত বা সুক্ষ্ম নয়। আকৃতিও বিশাল বলা চলে না। এদের কার্যকারিতা আশানুরূপ হবে, এমন ধারণা অসঙ্গত।

মর্ত্যলোক থেকে আমরা বহিঃস্থ আন্তর্জাগতিক কোনো সভ্যতা প্রেরিত সঙ্কেত গ্রহণ করি বা অন্য এক সভ্যতা আমাদের বা ভিন্ন লোকবাসী, অন্য তারকাকেন্দ্রিক কোনো সভ্যতার সঙ্কেত গ্রহণ করুক, উভয় ক্ষেত্রেই যদি বেতার-দূরবীক্ষণের ব্যবহার করা হয় তাহলে সে বেতার দূরবীক্ষণের আধুনিকীকরণ বিশেষ প্রয়োজন।

এই জাতীয় একটি কার্যকরী প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় সাইক্লোপ (Cyclope) প্রকল্পে। যোগাযোগে সফল হওয়ার জন্যে এটিতে থাকবে একটি বিশাল দূরবীক্ষণ ১৫০০ অ্যানটেনাযুক্ত, প্রতিটি অ্যানটেনা ১০০ মিটার ব্যাসবিশিষ্ট। ইলেকট্রনিক ব্যবস্থায় অ্যানটেনাগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত রইবে, সঙ্গে থাকবে অত্যন্ত জটিল কমপিউটার পদ্ধতি। কমপিউটারের প্রয়োজন কি কারণে? তার প্রয়োজন সঙ্কেতগুলির বিশ্লেষণে। দূরবীক্ষণকে অবলম্বন করে যত সঙ্কেত আসবে, সেই সব সঙ্কেত বিশ্লিষ্ট হবে, বুদ্ধিমত্তার অনুসন্ধান চলবে সঙ্গে সঙ্গে।

প্রকল্পটি ব্যাপক, বাস্তবায়িত হলে এটিকে নিঃসন্দেহে ঘন সন্নিবিদ্ধ করার চেষ্টা চলবে। কিন্তু পরিসরে এটি ২৫ বর্গ মাইলের চেয়ে কম হবে, মনে হয় না।

এ ধরনের একটি বেতার দূরবীক্ষণের নির্মাণ অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য প্রকল্প। কিন্তু এর অন্য আর একটি দিক আছে। এ একসঙ্গে বহু একক অ্যানটেনার মিলিত শক্তিতে কাজ করবে। বর্তমানে যে সব

বেতার-দূরবীক্ষণ আছে সেগুলির বার্তা সংগ্রহের ক্ষেত্রের চেয়ে এটির ক্ষেত্র কয়েক শতগুণ বড়। বহু শত আলোকবর্ষ দূরবর্তী কোনো গ্রহ থেকে যদি কোনো বেতার-সঙ্কেত আসে, তাহলেও সে বেতার-সঙ্কেত এই দূরবীক্ষণে ধরা পড়বে। তা ছাড়াও এই সাইক্লোপ সম্পর্কে বলবার মত আরও কিছু তথ্য আছে। পৃথিবীর দিকে প্রেরিত যে কোনো সঙ্কেত বা নির্দেশ গ্রহণের এটি সর্বশ্রেষ্ঠ যন্ত্র। অথচ এর বৈশিষ্ট্য, যে প্রযুক্তিজ্ঞান এই প্রকল্পের রূপায়নে প্রয়োজন, তা সম্পূর্ণরূপেই আমাদের অধিগত হয়েছে।

সাইক্লোপের অনুরূপ, কিন্তু সাইক্লোপের চেয়ে অনেক সংক্ষেপিত, ইংরেজী Y এর মত তিন বাহুবিশিষ্ট এবং ৮২ ফুট ব্যাসের ২৭টি অ্যানটেনাযুক্ত একটি বেতার-দূরবীক্ষণ প্রকল্পের কাজ চলেছে নিউ মেকসিকোতে।

যে বার্তাই আসুক, যে বার্তা সঙ্কেত ধরা পড়ুক, আন্তর্লোকবাসী প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন যে সভ্যতা যোগাযোগের উদ্দেশ্যে অর্থবহ এক বার্তা-সঙ্কেত প্রেরণে উদ্যোগী হবে, কোনো সন্দেহ নেই, গণিতে সে সভ্যতা অসামান্য ব্যুৎপত্তির অধিকারী হবে। সংখ্যা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা সেখানে থাকবে ; যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, ভগ্নাংশ প্রভৃতি সরল এবং প্রাথমিক প্রক্রিয়াগুলি অবলম্বনে সে সভ্যতার গাণিতিক নৈপুণ্য বিকাশ লাভ করবে। বিভিন্ন পরমাণুর গঠন প্রকৃতি সম্পর্কেও নিশ্চয় এ ধরনের উন্নত সভ্যতা অবহিত থাকবে। আন্তর্মহাজাগতিক যে কোনো সভ্যতার কাছে এই সব কিছুই অবশ্য জ্ঞাতব্য এবং এগুলি একেবারে সাধারণ জ্ঞানের মত। অবশ্য এ কথাও হয়তো ঠিক যে, যোগাযোগে উদ্যোগী সভ্যতার চিন্তা, যুক্তি এবং তর্ক আমাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, আমরা তার অনুমানও করতে পারি না।

যেখানে ভাষা অচল, রূপ অন্য, চিন্তা ভিন্ন পথগামী, অথচ বুদ্ধিবৃত্তি যেখানে প্রখর বিজ্ঞানীরা সেখানে নানাবিধ অসুবিধার মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তির উপরেই বিশেষভাবে নির্ভর করবার চেষ্টা করেছেন। বুদ্ধিবৃত্তি এবং সেই সঙ্গে আছে দর্শনেন্দ্রিয়। যে

কোনো উন্নত সভ্যতার ক্ষেত্রে এই দুয়ের কোনো বিকল্পও আছে বলে মনে হয় না। এই দুয়ের যোগে ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রে টেলিভিশন পদ্ধতি চালু করা যেতে পারে। সেখানে যোগ বিয়োগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট তরঙ্গ প্রয়োগ করা হবে। অনুরূপভাবে গুণ ভাগে এবং সমান চিহ্নের ক্ষেত্রেও। অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলির বেলায় কি হবে? প্রতিটি প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ? না, তা নয়, দুরূহ প্রক্রিয়াগুলিকে প্রাথমিক প্রক্রিয়া কয়েকটির সাহায্যে ব্যক্ত করা প্রয়োজন।

যদি এইভাবে আন্তগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হয় তাহলে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণী হিসেবে পিথাগোরাসের উপপাদ্যের চিত্ররূপ মন্দ হয় না।

আন্তগ্রহ যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই টেলিভিশন ব্যবস্থা একেবারে অভিনব নয়। মেরিনার প্রকল্পে মঙ্গল গ্রহ থেকে পৃথিবীতে ছাব এসেছে। কিন্তু এখানে যে যোগাযোগের চিন্তা তা আমাদের সৌরলোকের সীমাকে অতিক্রম করে গিয়েছে। দূরত্ব অসীম, অনন্ত পথ অতিক্রম করার সময়ে এ ব্যবস্থায় অনেক উন্নতি প্রয়োজন।

তবু এ কথা সত্য যে, টেলিভিশন ব্যবস্থা ছাড়া পরস্পরের বোধগম্য একটি ভাষায় এসে পৌঁছোনো কঠিন। আমাদের গ্রহের কথাই চিন্তা করা যাক না কেন, যে সব ভাষা পরস্পরের ভাব-বিনিময়ের জগৎ থেকে আজ হারিয়ে গেছে শিলালিপি দেখে তাদের কতগুলিকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে?

এই যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আর একটি দিকের কথা বিজ্ঞানীদের চিন্তায় এসেছে। তা হল প্রতীকী তর্কবিদ্যা (Symbolic logic)। আন্তগ্রহ যোগাযোগে এই প্রতীকী তর্কবিদ্যাকে কতটা প্রয়োগ সম্ভাবনাযুক্ত করে তোলা যায়? প্রতীক ধর্মী তর্কবিদ্যায় অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য কাজ করেন দুই দার্শনিক আলফ্রেড নর্থ হোয়াইটহেড (Alfred North Whitehead) ও বারট্রান্ড রাসেল (Bertrand Russell) এবং এঁদেরই কাজে

উৎসাহিত হয়ে এগিয়ে আসেন গণিতের অধ্যাপক হান্স ফ্রয়েডেনথল (Hans Freudenthal)। রাসেলের যুক্তিগ্রাহ্য ভাষার পরিমণ্ডল বিস্তৃত করে ফ্রয়েডেনথল এ ভাষার নাম দিলেন Lingua Cosmica বা সংক্ষেপে Lincos। এ এমন এক ভাষা যা অনুধাবনের জন্যে শুধু বুদ্ধিবৃত্তিরই প্রয়োজন। আন্তগ্রহ বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থায় যত সভ্যতা উদ্যোগী বুদ্ধিবৃত্তির অভাব তাদের কারোরই নেই, ফলে সেই দিক দিয়ে এই ভাষাকে অবশ্যই বিশেষ উপযোগী ভাষা বলতে হবে।

দশম অধ্যায়

যদি এমন হয়, আমরা কোনোদিন বহির্জাগতিক কোনো সভ্যতার সন্ধান পাই বা যদি বহির্জাগতিক কোনো সভ্যতা কোনো একদিন আমাদের সঙ্গে যোগাযোগে সমর্থ হয়! তখন, তখন কী হবে? হয়তো সে সভ্যতা আমাদের নক্ষত্রলোকে দূরবর্তী কোনো তারকাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এক সভ্যতা বা সে সভ্যতা আমাদের নক্ষত্রলোকের অন্তর্গতই নয়। অন্য এক নক্ষত্রলোকের বহু সহস্র আলোকবর্ষ দূরের কোনো তারকাকে আবর্তনরত গ্রহে গড়ে উঠেছে বুদ্ধিমান এবং প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন এক জীব, যোগাযোগ ঘটে গেল আকস্মিকভাবে যাদের সঙ্গে।

এই যোগাযোগের মুহূর্ত থেকে মানবসভ্যতার ক্ষেত্রে, না, শুধু মানবসভ্যতার কথা নয়, সমগ্র সৃষ্টির পরিমণ্ডলে এক নতুন যুগের সূচনা হবে, সন্দেহ নেই।

কিন্তু এই যোগাযোগের পরের অবস্থা কি? দূর-দূরান্ত থেকে সঙ্কেতে ভাষা শিক্ষা, বার্তা বিনিময় এবং ভাবের আদান-প্রদান?

ব্যাস, সেখানেই পরিসমাপ্তি? না, তা কখনও নয়।

যদিও একথা ঠিক যে, অনন্ত মহাশূন্যে সীমাহীন নক্ষত্রলোকের কোটি কোটি তারকার মধ্যে জীবন এবং প্রযুক্তিজ্ঞান আছে এরকম একটি সভ্যতার অস্তিত্ব নির্দেশ করাই যথেষ্ট।

কিন্তু কৌতূহল কখনও নিবৃত্ত হওয়ার নয়। ফলে যোগাযোগের পরের স্তর গ্রহান্তরে যাত্রা।

গ্রহান্তরে যাত্রার বিষয়টি কী ভাবে সংঘটিত হবে?

সহস্র আলোকবর্ষ দূরবর্তী দুটি গ্রহের একটি থেকে আরেকটিতে আলোর গতিবেগে ছুটে চললেও আমরা বুঝি সময় লাগার কথা এক

হাজার বছর, যাতায়াতে সে সময়কাল এর দ্বিগুণ, অর্থাৎ দু হাজার বছর। ফলে দুটি গ্রহের মধ্যে যাতায়াতের বিষয়টি নিশ্চয় একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য সমস্যা।

এই সমস্যা সমাধানের বিষয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানী একাধিক চিন্তা ভাবনা করেছেন। এক সৌরলোক থেকে অন্য সৌরলোকে যাতায়াতে পারমাণবিক শক্তিচালিত রকেট ব্যবহার করলে কেমন হয়! চিন্তা-ভাবনায় যে দূরত্ব অনতিক্রম্য বাস্তবে, পারমাণবিক রকেট অভিযানে কি সে দূরত্ব এই মানবজীবনে অতিক্রম করা সম্ভব হবে?

বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, সূর্যের অনুরূপ পৃথিবীর নিকটতম তারকাটিতে যদি মানব-আয়ুষ্কালের মধ্যে পৌঁছোতে হয় তাহলে আলোর গতিবেগের কাছাকাছি চূড়ান্ত পর্যায়ের গতিবেগ নিয়ে যাত্রা করা ছাড়া বিকল্প কোনো উপায় নেই।

কিন্তু আলোর কাছাকাছি গতিবেগ নিয়ে ছুটে চলা কি সম্ভব?

আন্তর্জাগতিক যোগাযোগের উদ্দেশ্যে যে মহাকাশযান ছুটে চলবে, আয়তনে তার ১৭ বা ১৮ টনের কম হলে চলবে না এবং এই রকম মহাকাশযানে আলোর গতিবেগের শতকরা দশ ভাগ সর্বোচ্চ গতিবেগ হিসেবে উঠতে পারে।

তা ছাড়া বিজ্ঞানীরা আরও দু একটি বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন।

একটি রকেটকে আলোর কাছাকাছি গতিবেগ নিয়ে চলতে গেলে কি তার পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ জ্বালানি বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব, হয়তো এই জ্বালানির সবটাই মহাকাশযানটিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার কাজে ব্যয়িত হবে, তবুও? বিজ্ঞানীরা আন্তর্জাগতিক যাত্রাপথের উপর থেকে জ্বালানি কুড়োতে কুড়োতে যাওয়ার কথা ভেবেছেন। সমগ্র নক্ষত্রলোকে হাইড্রোজেন পরমাণুরা ছড়িয়ে আছে। যদি এই হাইড্রোজেনকে আন্তগ্রহ যোগাযোগকারী মহাকাশযানের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়!

আলোর গতিবেগে ছুটে চলার সময়ে জ্বালানি বয়ে নিয়ে চলা সহজ কথা নয়। সেখানে এই জাতীয় কোনো ব্যবস্থাই অবলম্বন করা প্রয়োজন। সহজ সরল প্রচলিত পার্থিব এক পদ্ধতি সে ক্ষেত্রে কার্যকরী হবে, এমন আশা করা চলে না।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড! সীমাহীন দূরত্ব! বিস্তৃতিতে এ কত বড়? পরিবর্ধনে তো নয়ই এমন কি স্বাভাবিক আকার ও দূরত্ব অবলম্বনেও তাকে উপলব্ধি করা সহজ কথা নয়। ফলে মডেলের আকারে আমরা তার রূপটিকে প্রত্যক্ষ করবার চেষ্টা করি।

যদি সঙ্কোচনে আমরা আমাদের সূর্যকে নামিয়ে নিয়ে আসি একটি ডুমুরের আকৃতিতে তাহলে পৃথিবী হবে একটি বালুকণার অনুরূপ; সূর্য এবং পৃথিবীর অন্তর্বর্তী দূরত্ব ৩ ফুটের মত।

এই হিসেবে নিকটবর্তী তারকা ১৪০ মাইল দূরত্বে অবস্থান করছে এবং বিজ্ঞানীদের অনুমান প্রযুক্তিজ্ঞান সম্পন্ন উন্নত সভ্যতা আছে ২৫০০০ মাইলের কাছাকাছি কোনো জায়গায়।

তাহলে প্রথম যে বহির্জাগতিক সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ার কথা, কি অসীম দূরত্বেই না সে সভ্যতা বসবাস করছে! বেতার-সঙ্কেতে ছাড়া রকেটে এ রকম এক সভ্যতার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ বিজ্ঞানীদের কাছে সহজ কথা নয়। তবু আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব এই জাতীয় পথ পরিক্রমার ক্ষেত্রে একটি বিষয়ে বিজ্ঞানীদের আশার আলো শুনিয়েছে। সেটি হল সময় বা আমাদের বয়সের হিসেব নিয়ে। দুটি প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন সভ্যতার মধ্যে কি অসীম দূরত্ব! যোগাযোগে পাঁচ দশ বছর নয়, হয়তো শত বৎসর, দ্বিশত বৎসর বা তার চেয়েও বেশি সময় অতিক্রান্ত হওয়ার কথা। যদি কোনোদিন এমন হয়, আমরা, মনুষ্যবাসীরা রকেটে চেপে দূর দূরান্তে অন্য এক প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন সভ্যতার উদ্দেশ্যে চলেছি, সীমাহীন সময় পার হয়ে; রকেটের মধ্যেই দিনের পর দিন কেটে চলেছে, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, তারপর অর্ধশতাব্দী, ভাবতে আশঙ্কা বোধ হয়, মর্ত্যে যেখানে আমাদের আয়ু শতবর্ষ

অতিক্রম করে না, সেখানে মহাশূন্যে দ্রুতগতি রকেটের মধ্যে আমাদের অবস্থা কি হবে? আমরা অথর্ব, বৃদ্ধ, জরায় আক্রান্ত এমন এক পর্যায়ে উপনীত হব? কিন্তু সময়ের ব্যাপ্তি যদি দীর্ঘতর হয়!

আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ বলছে, যদি গতি দ্রুত হয় এবং আলোর কাছাকাছি এক গতিতে যদি যানটি ছুটে চলে তাহলে ওই দূরগামী যানের ভেতরেও সময় এগোবে, কিন্তু সে সময় এগোবে মর্ত্যের তুলনায় অনেক ধীর গতিতে।

যদি ১১ আলোকবর্ষ দূরে সূর্যের অনুরূপ একটি তারকার কথা কল্পনা করা যায়! প্রায় আলোর গতিতে ছুটে চলা, ধরা যাক, আলোর গতির প্রায় শতকরা ৯৯ ভাগ গতিবিশিষ্ট যানটিতে বসে আছে যাত্রীরা। কিন্তু ছুটে চলার মুহূর্ত থেকেই তো মহাকাশ যানটিতে এই গতি আরোপ করা সম্ভব নয়। সে গতি আসবে সময়ের ব্যবধানে।

ধরিত্রী যে শক্তিতে আমাদের নিয়ত আকর্ষণ করে, সেই আকর্ষণ শক্তিতে আমরা আমরণ অভ্যস্ত। ফলে যাত্রা শুরুর মুহূর্ত থেকে সেই আকর্ষণ-শক্তির সমান হারে আমরা মহাকাশযানের গতি সমানে বাড়িয়ে চলতে পারি। প্রায় আলোর গতিবেগের কাছাকাছি এক গতিতে আমরা পৌঁছে যাব এক বছরের মধ্যে। আবার লক্ষ্য গ্রহে অবতরণের এক বছর আগে তার যাত্রার শেষ পর্বে আলোর গতির তুলনায় মহাকাশযানটির গতি অনেকটা কমিয়ে আনতে হবে—তখনও ওই একই হারে গতিকে কমিয়ে আনা চলে। কিন্তু যাত্রা তো কেবল একমুখীন নয়। পৃথিবী থেকে যাত্রা শুরু করে অন্য গ্রহে পদার্পণের মত, সেই গ্রহ থেকে একই উপায়ে তাকে ফিরে আসতে হবে আমাদের এই পৃথিবীতে। এইভাবে ১২ আলোকবর্ষ দূরের সূর্যের অনুরূপ তারকাকেন্দ্রিক একটি গ্রহে যাতায়াতে তার সময় লেগে যাবে ২৮ বছর—অবশ্যই আমাদের মর্ত্যের সময়ের হিসেবে। আর যদি শুধু আলোকরশ্মির হিসেব করা যায়, তাহলে যাতায়াতে তার সময় লাগবে ২৪ বছর।

কিন্তু মহাকাশযানের ভেতরের যাত্রীরা সময় অতিক্রম করবেন অনেক মন্দ গতিতে। আলোর গতিবেগের কাছাকাছি এক গতিবেগে ছুটে চলার এই ফল। মর্ত্যের সময়ের হিসেবে যেখানে ২৮ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার কথা মহাকাশযানের ঘড়ি সেখানে যাত্রার প্রারম্ভ থেকে মাত্র ১০টি বছরের নির্দেশ দেবে।

কেন সময়ের এই বিচিত্র খেলা?

আলোর গতি এবং সময়ের অদ্ভুত সম্পর্কই এর কারণ। অন্ধকার ঘরে যখন আলো জ্বালাই, তখন কি হয়? সুইচ টিপবার মুহূর্তেই ঘরটি আলোকিত হয়। আমাদের পার্থিব জীবনে এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমরা অভ্যস্ত। আলোর গতিবেগ অসীম এবং সময় সেখানে অনড় বা অচল। কিন্তু আলোর কাছাকাছি গতিবেগে ছুটে চলার ক্ষেত্রে একাধিক বৈচিত্র্য নজরে আসার কথা। সময়ের যে অভিনব আচরণ তখন লক্ষ্যণীয় তা হল এই যে, প্রায় আলোর গতিবেগে ছুটে চলা দীর্ঘতর যাত্রাপথে সময় প্রায় নিশ্চল হয়ে আসে।

পৃথিবী যে শক্তিতে আমাদের আকর্ষণ করে, সেই আকর্ষণ শক্তির সমান হারে আমরা যদি যাত্রা শুরু করি, আবার অন্য গ্রহে অবতরণের পূর্বে যদি ওই একই হারে গতিকে কমিয়ে আনা যায়, তাহলে ১২ আলোকবর্ষ দূরত্বের পথ যেমন মহাকাশযানের সময়ের নির্দেশে ১০ বছরে যাতায়াত সম্ভব, তেমনি ১৩৭ আলোকবর্ষের মত দীর্ঘতর পথ মাত্র ২০ বছরেই যাওয়া আসা করা চলে।

অথচ পার্থিব সময়ের বিচারে তখন ২৭০ বছর অতিক্রান্ত হবে। যদি আরও দীর্ঘতর পথের কথা কল্পনা করি তাহলে ২৫ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত কোনো সভ্যতার সঙ্গে পার্থিব হিসেবে যোগাযোগ সেরে ফিরে আসতে সময় নেবে এর প্রায় দ্বিগুণ বছর। অথচ দীর্ঘতর পথের ক্ষেত্রে সময় আরও মন্দ গতি হয়ে প্রায় অনড় হয়ে আসবে। এই হিসেবে মহাকাশযানের ঘড়ির নির্দেশে যাতায়াতে সময় লাগবে মাত্র ৬০ বছর।

এখানে একটা কথা সকলেরই মনে হবে, বয়সের ভারে যে

শরীরের বিবর্তন, সে বিবর্তন কোন্ সময়ের আনুপাতিক, সময়ের কোন্ পরিমাপকে সে অনুসরণ করবে? মর্ত্যের, না মহাকাশযানের? নিঃসন্দেহে মহাকাশযানের।

মহাকাশযানের ঘড়ির নির্দেশ অনুসারেই মহাকাশযাত্রীদের সেখানে বয়স বাড়বে।

যেদিন আন্তর্লোকবাসী বুদ্ধিমান, প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন সভ্যতার অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যাবে, কিম্বা যেদিন দূরলোকবাসী দুই সভ্যতা পরস্পরের অস্তিত্বের কথা জানতে পারবে, সেদিন এক গ্রহের উন্নত জীব অন্য গ্রহে পদার্পণের উদ্দেশ্যে হয়তো আলোর গতিবেগের কাছাকাছি এক গতিবেগ নিয়েই যাত্রা শুরু করবে। কিন্তু আলোর সমান গতিবেগ নিয়ে নয় কেন?

তার কারণ আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের মধ্যেই নিহিত আছে। বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব এই কথা বলছে, আলোর গতির কাছাকাছি বেগে যদি কখনো কোনো বস্তু ছুটে চলে তাহলে সেই বস্তুটি দৈর্ঘ্যের দিক দিয়ে সঙ্কুচিত হবে, এবং শুধু দৈর্ঘ্যের সঙ্কোচন নয়, দৈর্ঘ্যের সঙ্কোচনের সঙ্গে সঙ্গে বস্তুটির ভরও বৃদ্ধি পাবে। এই আলোর কাছাকাছি গতিবেগ থেকে বস্তুটি যদি আলোর গতিবেগ প্রাপ্ত হয়, তখন? আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা সূত্র বলছে, বস্তুটি সে অবস্থায় দৈর্ঘ্যশূন্য হবে বাস্তবে যা অকল্পনীয় এবং অসম্ভব। ভরও নির্দিষ্ট থাকবে না। আলোর গতিবেগ প্রাপ্ত হলে বস্তুটির ভর হবে অনন্ত, অপরিমেয়। বিজ্ঞানীরা এই বিচিত্র অবস্থাকে ব্যাখ্যা করবার জন্যে বলছেন, কোনো বস্তুই কখনো আলোর গতিবেগের সমান গতিবেগে ছুটে চলতে পারে না।

আলোর গতিবেগ নিয়ে না ছুটে চলুক, আলোর কাছাকাছি গতিবেগ নিয়ে যে মহাকাশযানের অনন্ত মহাশূন্য পাড়ি দেওয়ার কথা বিজ্ঞানীরা চিন্তা-ভাবনা করছেন, সে যে অদূর ভবিষ্যতেই সংঘটিত হবে এমন নয়। কিন্তু এ কথা নিশ্চয়, একদিন তা ঘটবেই। এই ব্রহ্মাণ্ডে উন্নত প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন সভ্যতা যেদিন আর একটি

অনুরূপ সভ্যতার সন্ধান পাবে, সেদিন কেবল ভাব-বিনিময় এবং সঙ্কেত আদানপ্রদানের মধ্যে তা সীমিত থাকবে না। সভ্যতা তাকে চূড়ান্ত প্রাপ্তির দিকে টেনে নিয়ে যাবে। যাওয়া-আসা, একটি গ্রহবাসীর অন্য গ্রহে পদার্পণ এবং প্রত্যাগমন!

বিজ্ঞানীরা এই যাতায়াতের বিষয়ে আরও কিছু কিছু চিন্তা-ভাবনা করছেন। শুনলে বিস্ময় বোধ হয়, আমাদের এই পৃথিবীকে রকেট হিসেবে টেনে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনার দিকটিও তাঁদের পরিকল্পনায় আছে।

কিন্তু কোনো পরিকল্পনাই আজও একটি সুস্পষ্ট চেহারা নেয়নি। নেওয়ার কথাও নয়। যা অনাগত অথচ যার অস্তিত্ব সুনিশ্চিত, তার বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পন্থা উদ্ভাবন কী ভাবে সম্ভব?

পরিশিষ্ট

আজ বিজ্ঞানীদের তৎপরতা যদি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আর একটি সভ্যতার সন্ধান পায়, ভাবতে আশঙ্কা বোধ হয়, সে সভ্যতার সান্নিধ্যে আমরা কি ভাবে প্রভাবিত হব।

আমরা কি সে সভ্যতার যথার্থ প্রতিদ্বন্দ্বী, না কি আমরা সেই সভ্যতার তুলনায় একেবারেই অকিঞ্চিৎকর? প্রযুক্তিবিজ্ঞানের দিক দিয়ে আমাদের সভ্যতার ইতিহাস অতি সাম্প্রতিক কালের। কিন্তু এই সাম্প্রতিক ইতিহাসে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি আমাদের রীতিমত বিস্মিত করে। যদি অন্য সভ্যতার প্রযুক্তিবিজ্ঞানের ইতিহাস এক দীর্ঘতর কালে নির্দিষ্ট থাকে তাহলে সে সভ্যতা এক অকল্পনীয় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠবে। কে জানে, তখন যোগাযোগের ফল মঙ্গলজনক হবে কি না। কে বলবে, তখন সে সভ্যতা আমাদের কি রকম দৃষ্টিতে গ্রহণ করবে?

ক্ষমতা মানুষকে, না মানুষকে নয়, যে কোনো সভ্যতাকে অন্ধ করে তোলে। সভ্যতার এই বোধ হয় এক অন্যতম পরিহাস!

আজ বিশ্বের দুটি শক্তি ক্ষমতার মদমত্ততায় পরস্পরকে গ্রাস করার কথা চিন্তা করে। বহির্জাগতিক কোনো অখণ্ড শক্তি যদি যোগাযোগে আমাদের অস্তিত্বের সন্ধান পায়, আগ্রাসনের হস্ত প্রসারিত করে!

মানবসভ্যতা আজ তার যে শক্তি এবং যে অর্থকে নিয়োজিত করেছে বহির্জাগতিক জীবের সন্ধানে ও গবেষণায়, আগ্রাসনে তা মূল্যহীন মনে হবে না তো? মনে হবে না তো, এতদিনের সাধনা পণ্ডশ্রম মাত্র, আমরা ভুল পথে অগ্রসর হয়েছি?

সে আশঙ্কা যে নেই, তা নয়! কিন্তু অন্যদিকে, অফুরন্ত সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচিত হতে চলেছে।

আমাদের সভ্যতা এক মুহূর্তে সীমাহীন কাল অতিক্রম করে যেতে পারে। যে জ্ঞানার্জন ধারাবাহিক, সাধনায় যার সিদ্ধি;

নিষ্ঠায়, একাগ্রতায় যে অখণ্ডতা লাভ করে সে জ্ঞানার্জনের একটি পর্যায় থেকে আর একটি পর্যায়ে হয়তো শতাব্দী বা তার চেয়েও অনেক দীর্ঘতর কালের এক ব্যবধান, আমরা সহসা উত্তীর্ণ হব কৃষ্টিতে, সংস্কৃতিতে, এমন কি ধর্মেও।

সাধারণভাবে আমাদের পৃথিবীর ইতিহাস থেকেই আমরা দেখেছি, এককোষী জীব থেকে বুদ্ধিমান জীবের উৎপত্তিতে যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়, বুদ্ধিমত্তার একবার বিকাশ হলে তার অগ্রগতি হয় অত্যন্ত দ্রুত। জীবনের যে কোনো পরিবেশকেই সে বুদ্ধিমত্তা তখন নিজেদের প্রয়োজন মত মানিয়ে চলতে পারে। মানবসভ্যতা তার আপন ক্ষেত্রেও সে পরিচয় বহন করে। বিজ্ঞানীদের অনুমান, সভ্যতার সূচনায় যেদিন আগুনের উপরে মানুষ তার নিয়ন্ত্রণ এবং অধিকার প্রতিষ্ঠা করল, সেদিনই সভ্যতার ভবিষ্যৎ অনেকটা লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

কিন্তু বুদ্ধিমান সভ্যতার ক্ষেত্রে আর একটি আশঙ্কার দিক আছে। সেটি হল, বুদ্ধিমান সভ্যতার আয়ুষ্কাল। বুদ্ধিমত্তা যতই চূড়ান্ত বিকাশের দিকে অগ্রসর হয়, মহাজাগতিক কালের বিচারে নানা কারণে ততই তার আয়ুর বিস্তৃতি ক্ষীণতর হয়ে আসার কথা। জনসংখ্যার আধিক্য, খাদ্যশস্য ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীর আত্মহনন ও ধ্বংস এবং সভ্যতার আনুষঙ্গিক কুফল একটি সভ্যতার অস্তিমের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একদিকে সৃষ্টি এবং নব নব উন্মেষ, অন্যদিকে সংহার ও বিনাশ। কে জানে, কোন্ আশ্চর্য শক্তির অমোঘ নিয়মে সৃষ্টির মধ্যেই তার বিনাশের বীজ উপ্ত হচ্ছে।

তবু মানবসভ্যতার অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে যাক, এমন কথা কেউ বলবেন না।

আমরা সবাই প্রার্থনা করি, বহির্জাগতিক সভ্যতার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হোক। সে যোগাযোগ আমাদের ভবিষ্যৎকে নিরুদ্বিগ্ন এবং সুন্দর করে তুলুক।